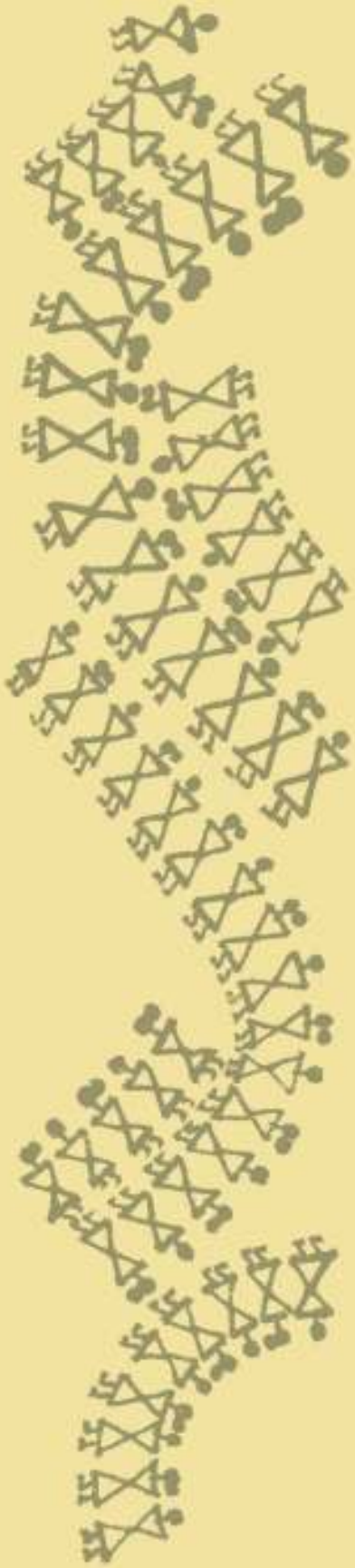

চাষের খবর

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২
এপ্রিল ২০০৮

বনাধিকার ও
খাদ্যসংকট
সংযোজনপত্র

চাষের কথা

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২ | এপ্রিল ২০০৮

উৎসর্গ

আয়লায়
মৃতজনদের
স্মৃতির
উদ্দেশে

চাষের কথা

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২
এ প্রি ল ২০০৮

• সূ • চি •

৫
অরণ্যের অধিকার আইন

১২
যৌথ বন-রক্ষা ব্যবস্থা ও জীবিকা উন্নয়ন

১৭
উন্নয়ন ও পরিবেশ

২১
খাদ্য সংকট ও খাদ্য নিরাপত্তা

৩১
গ্রাম-শহর বনাধিকার

সম্পাদক
সুব্রত কুন্ডু

সম্পাদনা সহযোগী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

হরফ **শিপ্রা দাস** রূপ ও প্রচ্ছদ **অভিজিত দাস** মুদ্রাকর **লক্ষ্মীকান্ত নস্কর**

অরণ্যের ভালো থাকা নির্ভর করছে দেশের অর্থনীতির উপর।দেশের অর্থনীতি কী চাইছে তার উপর। তাই এই সংখ্যায় আইন-উদ্যোগের পাশাপাশি, অরণ্যকে দেখা হয়েছে অর্থনীতির বড় প্রেক্ষিতে। সঙ্গে রয়েছে খাদ্য সংকট নিয়ে এই সময়ের এক অনিবার্য রচনা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।

ইচ্ছে ছিল আইনটির ভাষান্তর প্রকাশের। সময় ও পরিসর সুযোগ দেয়নি। প্রাসঙ্গিক বইটির কথা বলেছি। পাঠক অনুগ্রহ করে দেখে নেবেন। এই সুযোগে স্মরণ করি বীরসা মুণ্ডা ও তিলকা মাঝিকে। আজকের এই বনাধিকার আইন কার্যকারী হওয়ায় তাঁদেরও ভূমিকা বেশ।

অভিনন্দনসহ
সম্পাদক

জুলাই
২০০৯

অরণ্যের অধিকার আইন

প্রয়োগ ও নিয়মাবলি

মণিশঙ্কর আয়ার

অরণ্যের অধিকার বিলটি ২০০৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে পেশ করা হয়, তখন এর নাম ছিল ''শেডিউল্ড ট্রাইবস বিল, ২০০৫''। একবছর ধরে নানা আলাপ-আলোচনা, বাক্‌বিতণ্ডা ও পরিবর্তনের পর নতুন নামে (The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act. 2006) লোকসভায়, পরে রাজ্যসভা এবং সবশেষে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে বলবৎ হয়। ভবিষ্যতে এদেশের অরণ্যানির রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে এবং বিভিন্ন আদিবাসী ও অরণ্যবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে, এই আইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁদের এই অধিকার বহু বছর ধরে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। প্রথমে ঔপনিবেশিক শাসকরা এবং তার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে সবাই নিজেদের স্বার্থে অরণ্যকে ব্যবহার করবার জন্য, এই প্রাচীন অরণ্যবাসীদের অধিকার ও সুবিধা-অসুবিধা অগ্রাহ্য করেছে। অরণ্যবাসীদের মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে ক্ষোভ। অবশেষে আদিবাসী কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রক এই বিষয়টিকে হাতে নেয় এবং এই আইনকে দেশের বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চলে বলবৎ করবার দায়িত্ব নেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, আদিবাসীদের কল্যাণার্থে এই আইন প্রয়োগে 'গ্রামসভা' গুলিকে একটা বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলস্তরের এই গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি আদিবাসী ও অরণ্যবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং আমাদের অমূল্য অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই আইনকে ঘিরে একদিকে আদিবাসী অধিকার আন্দোলনকারী এবং অন্যদিকে অরণ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংগঠনের মধ্যে বিস্তর টানাপোড়েন চলে। তাঁদের মতামত, আশঙ্কা ও সন্দেহ নিয়ে নানাভাবে প্রচারাভিযান চালায় তাঁরা। সংসদে এঁদের প্রতিনিধি সদস্যদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে। অবশেষে ২০০৮-এর জানুয়ারি মাসে যৌথ সংসদীয় কমিটির অনুমোদন লাভের পর এই বিলটি আইনে পরিণত হয়।

আদিবাসীরা বংশানুক্রমে অরণ্যে বসবাস করছেন। কাঠকুটো, মধু, গাছের বাকল ও ফলমূল বা পাতা কুড়িয়ে ও ব্যবহার করে তাঁদের জীবন কাটে। আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষও এইভাবেই অরণ্যের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের চৌহদ্দির ভিতর অনেক গ্রাম আছে এবং এইসব গ্রামবাসীদের প্রায়শই বন দফতরের কাজে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বছরের পর বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। অথচ এঁদের কোনও দলিল-দস্তাবেজ বা নথি না থাকার ফলে,অরণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে থাকার অধিকার তাঁরা আইনত প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না।

আবার বন দফতরেই বিভিন্ন আইনের

ভিত্তিতে বিচার করলে এইসব আদিবাসীরা 'অবৈধ' বা আইন লঙ্ঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। একদিকে এইসব আদিবাসীদের প্রথাসিদ্ধ অধিকার আর অন্যদিকে আইনি স্বীকৃতির অভাবে তাঁদের অধিকারের অমর্যাদা—এই দ্বন্দ্বের প্রতিকার করবার জন্যই এই আইন। আদিবাসী বা অরণ্যবাসী সাধারণ মানুষ এই আইনের চোখে তাই আলাদা নয়। যাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, সেইসব অরণ্য-নির্ভর মানুষদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য।

এই আইন অনুযায়ী, অরণ্যবাসীরা অরণ্যের জমিতে থাকতে পারবেন, তাতে চাষবাস করতে পারবেন, কাঠ বাদে অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবেন, জমির ওপরে স্বত্বও পাবেন তাঁরা। বনাঞ্চলের গ্রামকে রাজস্ব-গ্রামে পরিণত করবার এবং সেসব গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি করবার অধিকারও তাঁদের দিচ্ছে এই আইন। সেইসঙ্গে এইসব অরণ্যবাসী ও গ্রামসভার ওপর এসে পড়ছে কয়েকটি অধিকার যা প্রকারান্তরে দায়িত্বও বটে। বনাঞ্চলের সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, রক্ষণাবেক্ষণ, বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা, জৈব বৈচিত্রের রক্ষণাবেক্ষণ,মেধাস্বত্বের অধিকার রক্ষা, আদিবাসীদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত রীতি-রেওয়াজ বজায় রাখা এবং জৈব বৈচিত্র সম্পর্কে তাঁদের বংশানুক্রমিক জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে এঁদের ওপরেই। এইসব দায়িত্ব রক্ষার জন্য গ্রামসভাগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী, জৈব বৈচিত্র ও অন্যান্য বনজ সম্পদ যাতে কোনোওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা দেখবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামসভাগুলির ওপর। যে সমস্ত অরণ্যবাসীকে আইন বলবৎ হওয়ার আগে বা পরে বনাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের পুর্নবাসন শুধু নয়, বিকল্প জমি দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে বলে এই আইনে বলা হয়েছে। স্কুল,ডিসপেনসারি, অঙ্গনওয়াড়ি, রেশন দোকান, খাবার জলের পাইপলাইন, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য সরকার অনেক সময়ে অরণ্য ও অরণ্য সংলগ্ন জমি ব্যবহার করেছে। আইনানুযায়ী সরকারকে এইসব জমির পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। এখন থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার অনুমোদন থাকলে, তবেই এইসব কাজে অরণ্যের জমি ব্যবহার করা যাবে। সুতরাং, শুধুমাত্র অরণ্যের অধিকার নয়, গ্রামের মানুষের নানা প্রয়োজন মেটাবার একটি সংস্থানও এই আইনে রয়েছে।

যে সমস্ত অরণ্যবাসীকে আইন বলবৎ হওয়ার আগে বা পরে বনাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের পুর্নবাসন শুধু নয়, বিকল্প জমি দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে

কীভাবে দাবি করবেন

অরণ্যের অধিকার চিহ্নিত করবার এবং পরে সে অধিকার প্রদান করবার ব্যাপারে যে নিয়মের মাধ্যমে এগোতে হবে, সে সম্পর্কেও এই আইনে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। গ্রামের প্রচলিত সংস্থাগুলি সহ সমস্ত গ্রামসভা, গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা মিলিতভাবে এই অধিকার চিহ্নিতকরণে অংশগ্রহণ বা সাহায্য করবেন। এছাড়া রাজ্য সরকার, রাজ্য, জেলা ও সাবডিভিশন স্তরে কমিটি গঠন করবে। সাবডিভিশন স্তরের কমিটি (SDLC)-র নেতৃত্বে থাকবেন সাবডিভিশনাল অফিসার

(SDO) এবং এই কমিটিতে থাকবে ব্লক–তহশিল স্তরের পঞ্চায়েতের ৩ জন সদস্য। এই তিনজন সদস্যর মধ্যে একজন হবেন মহিলা ও বাকি দুজন অরণ্যবাসী। এই ৩ জন ছাড়াও কমিটিতে থাকবে বন ও আদিবাসী কল্যাণ দফতরের অফিসাররা। ঠিক একইভাবে জেলাস্তরীয় কমিটি (DLC)-র নেতৃত্বে থাকবেন ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর। কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন জেলা পঞ্চায়েতের* ৩ জন সদস্য (দুজন অরণ্যবাসী ও একজন মহিলা) এবং বন ও আদিবাসী কল্যাণ দফতরের কর্মী।

কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অরণ্যের অধিকার কী এবং তা লঙ্ঘিত হল কিনা, তা বিচার করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রামসভার ওপর। এর জন্য প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি 'গ্রামসভা' আহ্বান করবে। তারপর তাদের ভিতর থেকে ১০-১৫ জন ব্যক্তি নির্বাচিত হবেন অরণ্যের অধিকার কমিটির সদস্য হিসেবে। অরণ্যের অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ বা আবেদন জমা পড়বে এই কমিটির কাছে। যে সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে আবেদন বা দাবি জমা পড়বে তা যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পড়ে (কমিটি গঠনের ৩ মাস আগে), তা দেখতে হবে। তাছাড়া নিয়মাবলিতে যে সমস্ত প্রমাণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত দুটি প্রমাণ সাপেক্ষে এই দাবি করা যাবে। কত ধরনের প্রমাণ গ্রাহ্য করা হবে তা ১৩ নং বিধিতে বলা আছে যেমন — সরকারি নথিপত্র, স্যাটেলাইট চিত্র, কার্য পরিকল্পনা বা বন দফতরের অন্যান্য নথি, ভোটারদের পরিচয়পত্র, রেশনকার্ড, পাসপোর্ট, গৃহ-করের রসিদ, আইনি নথি ইত্যাদি। ৩ মাসের সময়সীমার আগেকার কোনও দাবি গৃহীত হবে কি না, তা বিবেচনা করবার অধিকার গ্রামসভার থাকবে। আবেদনকারীদের নাম, দাবির সমস্ত বিবরণ নথিভুক্ত করবে গ্রামসভা। প্রতিটি দাবির ক্ষেত্রে আইনে কী সংস্থান রয়েছে তাও উল্লেখ করতে হবে সেই খাতাতে। কমিটির এইসব প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, উভয়পক্ষের অভিযোগ ও বক্তব্য শোনবার পর, প্রতিটি দাবির জন্য আলাদাভাবে Resolution পাস করবে গ্রামসভা এবং প্রতিটি Resolution SDLC-র হাতে তুলে দেবে।

গোষ্ঠীগত অরণ্যসম্পদ Community Forest Resource চিহ্নিত করবার প্রক্রিয়া শুরু করবার জন্য, একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে দেবে গ্রামসভা। যদি সেই অরণ্য সম্পদ অন্যান্য আশেপাশের গ্রামের আওতায় এসে যায়, তবে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা ও SDLC কেও এ ব্যাপারে জানাতে হবে। দুই বা তার বেশি গ্রামসভার মধ্যে এইসব ব্যাপারে সংঘাত বাঁধলে তার নিষ্পত্তি করবে SDLC। জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক) ও অভয়ারণ্য সংক্রান্ত বিবাদ ও দাবিদাওয়ার ব্যাপার থাকলে, পুনর্বাসন প্যাকেজ-এর [৪ নং ধারার (২) অনুযায়ী] মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে।

অরণ্যের অধিকার কমিটি

অরণ্যের অধিকার কমিটির কাজ হল, অরণ্যের অধিকার আইনের ভিত্তিতে যে

* পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সম্ভবত জেলা পরিষদ - **সম্পাদকীয় সংযোজন**

সমস্ত দাবি করা হয়েছে এবং জমা পড়েছে সেগুলি সরেজমিনে গিয়ে যাচাই করা এবং গ্রামসভাকে অধিকার রূপায়ণে সহযোগিতা করা। যাঁরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে আবেদন করতে চান, তাঁদের নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করানো, তাঁদের দাবি সংক্রান্ত প্রমাণ ইত্যাদি নথিভুক্ত করা, দাবি যাঁরা করছেন তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করা—এইসব হল ওই কমিটির প্রথম পর্যায়ের কাজ। এরপর বন দফতর ও আবেদনকারীদের খবর দেওয়া হলে এই কমিটির সদস্যরা স্বয়ং জায়গায় উপস্থিত থেকে দাবি ও প্রমাণ ইত্যাদির সত্যাসত্যতা যাচাই করেন, প্রয়োজনে ও সম্ভব হলে আর প্রমাণ জোগাড় করেন।

যাযাবর ও কৃষি-পূর্ব গোষ্ঠীগুলির দাবিগুলিকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিপক্ষ দলগুলির উপস্থিতিতে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রয়োজনে জমির চৌহদ্দি নির্দেশক চিত্রসহ মানচিত্র প্রস্তুত করে, নথিপত্র গ্রামসভার কাছে জমা করতে হবে। গ্রামসভার তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি সম্বলিত আবেদনগুলি সমস্ত নথি ও প্রমাণ যাচাই করবার পর, প্রস্তুত করবার দায়িত্ব এই কমিটির। পাশের গ্রামসভার সঙ্গে দাবিগুলি জড়িত থাকলে, তাদের সঙ্গে যৌথ–বৈঠক করবার দায়িত্বও এই অরণ্যের অধিকার কমিটিরই।

সাবডিভিশন কমিটির কাজ

সাবডিভিশন স্তরীয় কমিটির কাজ হল এই আইনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে গ্রামসভাকে সাহায্য করা। এর জন্য তারা গ্রামসভা—অরণ্যের অধিকার কমিটিকে মানচিত্র, নির্বাচন তালিকা (ইলেকটোরাল রোল) দিয়ে, আইনের বিভিন্ন নিয়ম ও সুযোগসুবিধা সম্পর্কে অরণ্যবাসীদের সচেতন করে তুলে, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে দাবি জানানোর ফর্ম বিতরণ করে এবং গ্রামসভার বৈঠকগুলি যাতে খোলামেলাভাবে হতে পারে সে ব্যবস্থা করে —ইত্যাদি নানাভাবে SDLC এই কাজে সাহায্য করে। দাবি ও আবেদনের সত্যাসত্য সরেজমিনে যাচাই করে দেখার পর, গ্রামসভার দেওয়া মানচিত্র অন্যান্য বিবরণ ও Resolution গুলির ভিত্তিতে দাবিগুলি যুক্তিসংগত কিনা তা বিচার করা এবং অরণ্যের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ও ঘটনা সম্পর্কে গ্রামসভাগুলির সমস্ত বক্তব্য শোনা, এই কমিটির অন্যতম কর্তব্য। গ্রামসভার Resolution দ্বারা যে সমস্ত পক্ষ প্রভাবিতহচ্ছে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি কিংবা রাজ্য সরকারি এজেন্সি—তাদের বক্তব্য শুনে নেওয়াও এই কমিটির কাজ। প্রয়োজনে এই কমিটি অন্যান্য SDLC-র সঙ্গে আলোচনা করতে পারে, বিশেষ করে সেইসব দাবির ক্ষেত্রে, যেখানে একাধিক সাবডিভিশন জড়িত।

সরকারি নথিপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার পর ব্লক অথবা তহশিল-এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত অরণ্যের অধিকারের ড্রাফট - রেকর্ড তৈরি করে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য জেলাস্তরীয় কমিটির কাছে পেশ করে SDLC গ্রামসভা গৃহীত Resolution-এর বিরুদ্ধে কোনও Petition, আবেদন, আর্জি থাকলে সে বিষয়ে শুনানির জন্য একটি দিন ধার্য করা এবং তা লিখিতভাবে অথবা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে

যাযাবর ও কৃষি-পূর্ব গোষ্ঠীগুলির দাবিগুলিকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিপক্ষ দলগুলির উপস্থিতিতে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে

দেওয়া SDLC-র দায়িত্ব। গ্রামসভা এবং অরণ্যের অধিকার-এর যাঁরা ধারক তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানানোর কাজও এই SDLC-রই। সেই অঞ্চলের জৈব বৈচিত্র, সেখানকার প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য, বনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের উপায় ও পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব এই কমিটির।

জেলাস্তরীয় কমিটি

জেলাস্তরীয় কমিটির কাজ হল, আদিবাসী ও অন্যান্য অরণ্যবাসীদের দাবি, অরণ্যের অধিকার আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে করা হয়েছে কি না তা দেখা—SDLC দ্বারা প্রেরিত দাবি ও আবেদনগুলি বিবেচনা করে তা মঞ্জুর করা, SDLC-র নির্দেশ যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিয়ে থাকে; সেক্ষেত্রে সে পক্ষের বক্তব্য বা আর্জি শোনা; সংলগ্ন জেলা জড়িয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করা; বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে অরণ্যের অধিকার-এর বিষয়টি যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা সুনিশ্চিত করা; অরণ্যের অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাবলি সম্বলিত একটি রেকর্ড-পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং আবেদনকারী ও সংশ্লিষ্ট গ্রামসভাগুলির কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

এই আইন কার্যকর করবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তবে লক্ষ কোটি অরণ্যবাসীর বিপর্যস্ত জীবন ও তাঁদের ওপর এই আইনের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা ভেবে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদেরকে এই আইন যথাশীঘ্র কার্যকর করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই আইন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য যাতে সাধারণ মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং একে কার্যকর করবার ব্যাপারে, যাতে যথাসম্ভব স্বচ্ছতা অবলম্বন করা হয়, সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীরই পরামর্শে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ দফতর সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছে যে, তারা যেন একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতগুলির সম্মেলন ডেকে তাদের সদস্যদের এই আইনের সংস্থানাদি সম্পর্কে সবিস্তারে জানান। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে কাজ হয়েছে এবং সমস্ত রাজ্যে (যেসব রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সেগুলি বাদে) এইসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই আইন অরণ্য-নির্ভর জনগোষ্ঠীগুলিকে তাঁদের অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়ার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ দিচ্ছে। এই আইন সব ধরনের অরণ্যের প্রতি প্রযোজ্য। এইসব অরণ্য নির্ভর মানুষদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অরণ্যের জমি ব্যবহারের সংস্থানও আছে এই আইনে। কোনও অধিকার একবার স্বীকৃত হয়ে গিয়ে থাকলে, তার রদবদল খুব সহজ হবে না। যাঁদের অধিকার স্বীকৃত, তাঁদের জীবনধারণ বা কাজকর্মের জন্য যদি সত্যিই অরণ্যের পশুপাখি, গাছপালার বড় রকমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং রাজ্য সরকার যদি নিশ্চিত হতে পারে যে, মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের সহাবস্থান সেই বিশেষ ক্ষেত্রে

কোনো মতেই সম্ভব নয়; তবেই এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা হবে। তবে এর পরিবর্তে যে পুনর্বাসন প্যাকেজ বিকল্প হিসেবে দেওয়া হবে, তা গ্রহণযোগ্য হওয়া দরকার এবং গ্রামসভার সেই প্যাকেজ সম্পর্কে পূর্ণ সম্মতি থাকা দরকার। শুধু তাই নয়, বিকল্প জমির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগসুবিধাসহ এই প্যাকেজগুলি আগে কার্যকর করতে হবে এবং এই জমি যাতে ভবিষ্যতে কখনও অন্য কাজে ব্যবহৃত না হয়, সে আশ্বাস সরকারকে দিতে হবে। আইনের এইসব সংস্থানগুলি তাঁদের পক্ষেই প্রযোজ্য, যাঁদের এই আইন বলবৎ হওয়ার আগেই কোনোরকম পুনর্বাসনের সুবিধা ছাড়াই উচ্ছেদ করা হয়েছে।

অরণ্যের গাছপালা ও পশুপাখির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও এই আইন দিয়েছে গ্রামসভা ও অরণ্যবাসীদের। অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ অঞ্চলের জলের ব্যবস্থাপনা ও জৈব বৈচিত্র নিরাপদ রাখার দায়িত্বও সেই সঙ্গে রয়েছে। এছাড়া যাঁরা অরণ্যে বা অরণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করছেন, তাঁরা যাতে কোনোরকম ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের শিকার না হন এবং তাঁদের জীবনযাত্রায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামসভাগুলিকে।

অর্থাৎ যাঁরা অরণ্যের ওপর নির্ভরশীল, যাঁদের জীবন অরণ্যকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, তাঁরাই অরণ্যের সবরকম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে ও অরণ্যের সম্পদের ব্যবহার যাতে তার দীর্ঘস্থায়িত্বের কথা ভেবে (Sustainable) করা হয় তা সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব এখন থেকে এঁদের এবং সেইসঙ্গে গ্রামসভাগুলির। যে অরণ্য তাঁদের যুগ-যুগান্তর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এবার এঁরা নেবেন। প্রাচীন এই পরস্পর-নির্ভর সম্পর্ককে তাঁরা লোভের হাতছানিতে হারাবেন, না সংযমের সঙ্গে লালন করবেন— সেটাই দেখার।

উপসংহার

জমি আজ অপর্যাপ্ত, অকুলান। আইন অনুযায়ী উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসী ও অরণ্যবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে, কোথায়। অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত ঘটছে, ফলে আইন রূপায়ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং, একদিকে আইন এবং অধিকারের দাবি এবং অন্যদিকে রাজ্য সরকারগুলির সীমাবদ্ধতা—এর মাঝে রয়েছে গ্রামসভাগুলি। যথেষ্ট জটিল এক অবস্থায় দাঁড়িয়ে তারা। সর্বস্তরের সহযোগিতা এবং যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের হাতে না দিলে, এই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন তাদের পক্ষে কঠিন। অধিকার স্বীকৃতি যাতে কাগজে-কলমেই না থেকে যায়, হতদরিদ্র ও শোষিত এই মানুষগুলো যাতে এক জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আর এক ফাঁদে পা না দেয়, তা সুনিশ্চিত করবার দায়িত্বতো এই গ্রামসভাগুলিরই। যাঁরা অধিকার পেলেন, যাঁরা অধিকার ভোগ করবেন, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁদেরই দেওয়া হল—এ একরকম ভালো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এক বিরাট প্রলোভনের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল এই দরিদ্র মানুষগুলিকে। যাঁরা অবৈধভাবে

আইনের এইসব সংস্থানগুলি তাঁদের পক্ষেই প্রযোজ্য, যাঁদের এই আইন বলবৎ হওয়ার আগেই কোনোরকম পুনর্বাসনের সুবিধা ছাড়াই উচ্ছেদ করা হয়েছে

অরণ্যসম্পদকে ব্যবহার করেন, তাঁরা তাঁদের স্বার্থ ত্যাগ করবেন এমনটা ভাবার কোনও অর্থ নেই। তাঁরা বিভিন্ন প্রলোভনের সাহায্যে নিজেদের কাজ হাসিল করবার চেষ্টায় থাকবেনই। এই যে বিরাট অরণ্যভূমি—তার জৈব বৈচিত্র, তার বিরাট পরিবেশগত তাৎপর্য—এসব তো কোনও একটি দেশের সম্পদ নয়। এর দ্বারা উপকৃত গোটা মানবজাতি। তাই অরণ্যের অধিকারের স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য—পরিবেশ তথা অরণ্য সংরক্ষণ না আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

অরণ্যসম্পদের ব্যবহারকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করে তুলতে হলে, অরণ্য ও অরণ্যবাসীদের পারস্পরিক নির্ভরতার এই সম্পর্ককে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। নতুন এই আইন গ্রামসভাকে এ ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব দিয়েছে। কীভাবে অরণ্যসম্পদ সদ্ব্যবহারের বিষয়টি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে, অরণ্যের জমি অন্য কাজে ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা, কল্যাণমূলক কাজের জন্য যদি কোনও জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েও বা পড়ে, তা যাতে ন্যূনতমভাবে হয় এবং একান্ত প্রয়োজনে হয়, তা দেখার দায়িত্বও এই গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলির ওপরই দেওয়া হয়েছে। এ বড় গুরুদায়িত্ব। তবে তৃণমূল স্তরের এই গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, এজন্য তাদের প্রয়োজন সর্বস্তরের সহযোগিতা। রাজ্য ও জেলা প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল—এদের সবার সহযেগিতা থাকলে, এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সাফল্যের সাক্ষী আমরা অবশ্যই হতে পারব। ◘

যোজনা-ধনধান্যে
সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রিত

শ্রী মণিশঙ্কর আয়ার কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রীর ভূমিকায় আসীন ছিলেন।

আইন নিয়ে বিশদে জানতে নীচে বলা বইটি সহায়ক হতে পারে :

‘বনরধিকার আইন ২০০৬’ লড়াইয়ের হাতিয়ার প্রকাশক : নাগরিক মঞ্চ || পেপারব্যাক ২০ টাকা|| হার্ডবাউন্ড ৪০ টাকা || দূরভাষ ৯৮৭৪৩২১০৫৬

যৌথ বন-রক্ষা ব্যবস্থা ও জীবিকা উন্নয়ন

ড. অজিত ব্যানার্জী

ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষে এসেছিল, তারা দেখেছিল ভারতবর্ষে বনের এলাকা অনেক। অনেক এলাকা জুড়ে বন আছে। সেখানে প্রচুর গাছপালা আছে। বনজ সম্পদের পরিমাণ অনেক। সেই বনের কাঠকে তারা জাহাজ বানানো, বাড়ি বানানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে শুরু করল। কিন্তু ক্রমশ তারা দেখল যে অনেক মূল্যবান গাছ আছে, যেগুলি সবাই ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ফলে তারা এই বনসম্পদকে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ নিল। এই জন্য ১৮৬৪ সালে প্রথম 'বন আইন' তৈরি হল। এই আইন তৈরি হলে ব্রিটিশদের ধারণা জন্মাল যে, এই বন ও বনসম্পদের উপর অধিকার শুধু তাদের একার। এখানে প্রবেশ এবং ওই সম্পদ ব্যবহারের কোনো অধিকার অন্যদের নেই।

আইনে তিনটি অংশ ছিল :

১. সংরক্ষিত বন (Reserve Forest)– এখানে বাইরের কেউ ঢুকতে ও বনসম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত।

২. সুরক্ষিত বন (Protected Forest)– এই বনগুলিতে প্রবেশের এবং বন ব্যবহারের কিছু কিছু অধিকার অন্যদের থাকবে।

৩. গ্রামের বন (Village Forest)– এই ক্ষেত্রে যদি ব্রিটিশ মনে করে কোনো বন গ্রামের কাজের ব্যবহারের জন্য দেবে, তবেই সেই বন গ্রামবাসীরা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বন সরকারের আওতায় থাকবে।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ১.৭ শতাংশ বন রূপান্তরিত হয়েছে গ্রামের বন হিসেবে। সবমিলে মানে দাঁড়াল, ব্রিটিশ আসার আগে যদিও বনগুলোর মালিক ছিল সাধারণ মানুষ। কিন্তু আইন প্রণয়নের পর কোথায় যেন মানুষকে বেঁধে ফেলা হল। বলা হল–

বন আমাদের, তোমরা বহিরাগত। বন ব্রিটিশের, ব্রিটিশরাই এই সম্পদকে জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্র যেমন জাহাজ বানানো, রেললাইনের স্লিপার তৈরি, বড় বড় বাড়ির জানলা-দরজা তৈরি ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করবে।

বন ও বনের সম্পদকে দেখাশোনা করার জন্য বন দফতর তৈরি হল। ভারতবর্ষে এই দফতরই সব দফতরগুলির মধ্যে পুরোনো। এই দফতরের বেশিরভাগ আধিকারিকই ব্রিটিশ ছিলেন। পরবর্তীকালে কিছু কিছু ভারতীয় বিশেষত বাঙালিরাও যোগ দেন। দফতরের ইংরেজ আধিকারিকদের টেকনিক্যাল ফরেস্ট্রি সম্পর্কে পড়াশুনার জন্য প্রথমদিকে বিদেশে পাঠানো হত। তারপর দেরাদুনে

বনশিক্ষা বিদ্যালয় বা Forest Institute তৈরি করা হল। সেখানে এই শিক্ষা শুরু হল। বনসম্পর্কে ইংরেজদের সাধারণ জ্ঞান খুব কমই ছিল। এই আধিকারিকরা যখন বিদেশে প্রথম প্রথম প্রশিক্ষণ নিতে যেত, তখন জার্মানরা তাদের প্রশিক্ষণ দিত।

জার্মানদের বন সম্পর্কে জ্ঞান খুব বেশি। Brandis নামের এক জার্মান ভদ্রলোককে বলা হয় The Father of Indian Forestry and Forest Design. যাই হোক, এই শিক্ষার্থীরা মূলত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হচ্ছিল। জাতীয় স্বার্থে বন ব্যবহার এই ধারণায় তারা শিক্ষিত হচ্ছিল। বনের মূল ব্যবহার্য কাঠ আর কাঠের ব্যবহারের উপরই তারা ধ্যানধারণা পেত। জার্মানিদেরও এই কাঠ ব্যবহারের উপরই ধ্যানধারণা ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার গঠিত হল। এবার বনগুলি, যেগুলি আগে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল, সেগুলি জাতীয় সরকারের হাতে চলে এল। তখনও কিছু ব্যক্তিগত ও বেসরকারি বন ছিল—যেমন, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বন, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির পাশ দিয়ে জলপাইগুড়ির দিকে—ডুয়ার্সের বন ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর এই ব্যক্তিগত বন (Private Forest) গুলো সরকারের দখলে চলে গেল। ফলে সাধারণ মানুষের বন ব্যবহারের যেটুকু অধিকার বা দখল ছিল, তা আস্তে আস্তে খর্বিত হতে শুরু হল। সাধারণ মানুষের, জমিদারির বনগুলি যতটুকু পাওয়ার অধিকার বা সুযোগ ছিল ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা আসার পর, সেটুকুও খর্ব হয়ে গেল। গ্রামের গরিব লোক, যারা বেশি করে বনের সম্পদ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল, সরকারি নিয়মে এদের বনসম্পদ ব্যবহারের সুযোগ গ্রাহ্য হল না। বন দফতরের লোক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ সৃষ্টি হতে শুরু করল।

সরকারি দফতরের সবসময়ই বন সম্পর্কে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করছি এই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মনে বনে ঢুকতে না পাওয়া, দফতরের লোকেদের ঘুষ নেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ক্ষোভ বাড়তে লাগল। বন রক্ষাকারী দফতর এবং বনের উপর নির্ভরশীল গ্রামের গরিব মানুষ, এই দুপক্ষের মধ্যে ক্রমশ একটা দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন বাড়তে শুরু করল। গ্রামের গরিব লোকেরা বন থেকে জ্বালানি, শালপাতা, বাবুই ঘাস ইত্যাদি মূলত সংগ্রহ করে। কিন্তু সেখানে বনরক্ষীদের তাদের উপর অত্যাচার চলতে থাকে। একদিকে সরকারি লোকেদের বন সম্পর্কে ধারণা– Forest for the nation, not for the local people, পাশাপাশি বন দফতরের লোকেদের অত্যাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া, গ্রামবাসীদের জড়ো করা ঘাস ও কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, গোলাগুলি চালানো—ইত্যাদি ঘটনায়, একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। এই দুদিকের লোকের মধ্যে কোনো ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। দ্বন্দ্ব এবং চাপানউতোর দিন দিন বেড়েই চলছিল।

এরপর শুরু হয় Socio economic study of forest with the villages। এই Study-র কাজ শুরু হল আগে

আরাবারিতে। আরাবারি এমন একটা জায়গা যেখানে ১২০০ হেক্টর জঙ্গল। যেখানে বন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে জঙ্গল বাঁচানোর একটা উদ্যোগ নেওয়া হল। গ্রামের লোকেদের এই বিষয়টি

সম্পর্কে বুঝিয়ে রাজি করানো হল। বন তৈরির ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বন দফতরের একটা সমঝোতা হল। গাছ বসানো এবং যে গাছ আগে ছিল, তা বাঁচানোর চেষ্টা হল। গাছ বসানোর কয়েকবছর পর দেখা গেল সুন্দর জঙ্গল তৈরি হয়েছে। দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হল—১০ বছর পর উৎপাদনের ১/৪ শতাংশ পাবে গ্রামবাসীরা আর বনের অন্য সামগ্রী ৩/৪ শতাংশ নেবে বন দফতর।

আরাবারির 'মডেল'*[১] দেখে অনেকেই আগ্রহী হয় নিজ রাজ্যে ওই মডেল তৈরি করতে। আগ্রহী রাজ্যকে বলা হয়, যারা এই 'মডেল' অনুসরণ করবে, আরাবারির গ্রামবাসীদের যা যা দেওয়া হয়েছে, আগ্রহী রাজ্যের গ্রামবাসীদেরও সেইসব দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বন-ব্যবস্থাপনা*[২] বুঝতে একটা সমীক্ষার কাজ আমি করি।

পশ্চিমবঙ্গের ১১টা গ্রামে এই গবেষণার কাজ হয়েছিল। ১৭০টা পরিবারকে নির্বাচিত করা হয়েছিল গবেষণার জন্য। পরিবার প্রতি সদস্য সংখ্যা, আয়-ব্যয়, বন থেকে আয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর ইন্টারভিউ হয়েছিল। এলাকার সন্নিহিত বন অঞ্চলের পরিমাপ, গাছ, ঝোপ ও গুল্মের পরিমাণ সমীক্ষা করা হয়েছিল। বনরক্ষা কমিটির সভাগুলোয় উপস্থিত থাকা ও কমিটিগুলিকে সংগঠিত করা হয়েছিল। একটি জেলাসভা করে গ্রামবাসী এবং জেলার পদস্থ কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সমস্যা সমাধানে তাদের মতামতের জন্য।

গবেষণার ফলাফল

- পুরুলিয়ায় ৩টি, বাঁকুড়ায় ৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪টি অর্থাৎ মোট ১০টি গ্রামে যৌথ বন কর্মসূচি চলছে। আর যৌথ বন ব্যবস্থাপনা নেই এমন বন একটি আছে পুরুলিয়া জেলায়।
- প্রত্যেকটি কমিটি এলাকায় ১৮ থেকে ৪১৬ টি পরিবার আছে। প্রত্যেক পরিবারের ক্ষেত্রে ০.৪৩ থেকে ২.৭৭ হেক্টর বনের এলাকা পড়ে।
- অনেক লোকই গরিব। জীবিকা—কৃষিকাজ, সহ-জীবিকা—বনের সম্পদ সংগ্রহ।
- বন বিভাগ সরকার এবং বন-রক্ষা কমিটির (গ্রামবাসী) মধ্যে সম্পর্কে কিছুটা ভালো হয়েছে
- ব্যবস্থাপনার আগে বনের অবস্থা যা ছিল তার থেকে উন্নত হয়েছে। কিন্তু এ উন্নতি থেমে গিয়েছে, গতি হ্রাস হয়েছে।
- বনজ নানা সামগ্রীর সংগ্রহের হার বেড়েছে।
- প্রত্যেক পরিবারের বন থেকে বার্ষিক আয় ৫,০৯০ টাকা যা পরিবারের আয়ের ১১.৯ শতাংশ।

আরাবারির 'মডেল' দেখে অনেকেই আগ্রহী হয় নিজ রাজ্যে ওই মডেল তৈরি করতে

*[১] লেখাশেষ দেখুন

*[২] Joint Forest Management কে এই আলোচনায় 'যৌথ বন ব্যবস্থাপনা' ও 'যৌথ বন-রক্ষা ব্যবস্থা দুভাবেই বলা হয়েছে

- দফতর এবং কমিটির বন-রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব দেখা যাচ্ছে।*[৩] রাত্রে কিছু কিছু সময় পাহারা হয়। সবসময় হয় না।
- দফতর ও কমিটির সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, বনবিভাগের লোকেরা প্রায়ই আসে না, ফলে গ্রামের লোকেরা যখন কাউকে গাছ চুরির জন্য ধরে, তখন তাদের কোনোরকম শাস্তি দিতে পারে না, কারণ বনরক্ষা কমিটির সেই ক্ষমতা নেই। যখন বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয় দেখা যায় দফতর কম টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেয়।কিংবা জরিমানা না নিয়েই ছেড়ে দেয়। ফলে ক্ষুদ্ধ গ্রামবাসী জঙ্গল রক্ষার উৎসাহ হারাচ্ছে।
- নিয়মিত সভা হয় না, কারণ বন দফতরের লোকেরা আসে না। বন-রক্ষা কমিটি সভা ডাকে না, কারণ ফরেস্ট অফিসার ডাকবে এই অপেক্ষায় থাকে।*[৪]
- প্রত্যেক ফরেস্ট অফিসারের হাতে প্রায় দশটি করে বন-রক্ষা কমিটি আছে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে বন-রক্ষা কমিটি তৈরি হয়। অর্থাৎ ১০টি গ্রামের ১০টি বনরক্ষা কমিটি। একজন ফরেস্ট অফিসারের পক্ষে দশটি গ্রামের দশটি কমিটির সঙ্গে প্রতি মাসে সভা করা সম্ভব হয় না, ফলে সভা নিয়মিত হয় না, সম্পর্ক শিথিল হয়। অন্য দিকে গ্রামবাসীরা উৎসাহ হারায়। ফলে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেড়েছে।
- টাকাপয়সা খরচ করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব আছে। কোন্ ক্ষেত্রে খরচ হচ্ছে, কী কারণে খরচ হচ্ছে, কতটা খরচ হচ্ছে এসব কমিটি বা গ্রামবাসী জানতে পারে না।
- বাজেট নিয়ে বন দফতর কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে না। দফতর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিকাদার নির্বাচন করে।
- সভায় সিদ্ধান্ত নেয় মূলত বনবিভাগের কর্মী ও এলাকার কিছু ধনী লোক। সাধারণ গ্রামবাসী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।
- মেয়েরা সভায় যোগদান করে না।
- পাহারা প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পশু চলে আসে বসতিতে। ফলে ফসল, বাড়ি এমন কি জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- জানোয়ারের হানায় ঘরবাড়ি ও জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সদস্যরা প্রায়ই একটা অস্বাভাবিক পরিমাণের ক্ষতিপূরণ দাবি করে।
- সদস্যরা বাজারের দরদাম সম্পর্কে সচেতন নয় এবং বনজ দ্রব্য থেকে প্রস্তুত সামগ্রীর ক্রেতা কে জানে না।
- বনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের অধিকার কী হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনামা নেই। সরকারি বিভাগ বা রাজনৈতিক দল কেউই এটা নিয়ে কিছুই ভাবনাচিন্তা করেনি। এই

*[৩] ডিউটির সময় ৮ ঘণ্টা। পরিবার-প্রতি দুজন দায়িত্বে থাকে

*[৪] বন দফতর ও বন-রক্ষা কমিটির গঠনতন্ত্রে, প্রতিমাসে উভয়পক্ষের একযোগে সভা করার কথা বলা আছে

নিয়ে কোনও লেজিসলেটিভ অর্ডারও বের হয়নি।

- বন-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বন বিভাগের ভূমিকা কী হবে সেটা ঠিক নেই। অন্যান্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজ খুব কম।

বন-রক্ষা কমিটির প্রস্তাব :

- কমিটির সদস্যদের পরিচয়পত্র দেওয়া।
- সদস্যদের আইনী ক্ষমতা যাতে বনের স্বার্থরক্ষায় তারা ব্যবহার করতে পারে।
- স্বীকৃত সদস্যদের চলাচলের নিষেধাদেশে ছাড়।
- ছোট ছোট সহভাগী পরিকল্পনা করা এবং সম্পর্কিত দফতরকে যুক্ত করা।
- বন দফতরের গাছের কাঠ ব্যবহারের পরিকল্পনা।
- কাঠ ছাড়া অন্য সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ও গবেষণা।
- বনের পোকামাকড় সংরক্ষণ।
- বনরক্ষা কমিটির গ্রামগুলিতে বন ব্যবস্থাপনা কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছতা, আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা এবং বাজার সম্পর্কিত তথ্য রাখা।

বছরে একবার অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন নয়, বরং এই প্রস্তাবগুলির আলোচনা ও দফতর স্তরে সক্রিয়তাই যৌথ বন-রক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে পারে। ◘

ডিআরসিএসসি-র বোসপুকুর অফিসে আয়োজিত আলোচনার সভাবৃত্তান্তের কথাসংক্ষেপ

অনুলিখন : **শুক্লা দেব (মিত্র)**

আরাবারি জঙ্গল

আরাবারি জঙ্গল পশ্চিম মেদিনীপুরে। রানিগঞ্জ রোডে শালবনি ও চন্দ্রকোণা রোডের মাঝামাঝি। ১৯৭১-৭২ সালে এখানে গ্রামগুলিকে নিয়ে যৌথভাবে বনরক্ষার কাজ হয়। যাতে বনরক্ষা ও উপার্জন উভয়দিকেই ব্যতিক্রমী সাড়া মেলে। ২.২০ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি হয়। কাজ চলে ১৯৮৫ অব্দি। এই ভাবনার প্রস্তাবক ও রূপকার ছিলেন মাননীয় আলোচক। তিনি ওই অঞ্চলের তৎকালীন বন-আধিকারিক।

আরাবারি নিয়ে বই : **বাংলার বনজঙ্গল**। তপন মিশ্র || ষাট টাকা || পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ || দূরভাষ ২২৮৬ ৫৬৫৭ || ফ্যাক্স ২২২৭ ৫৩৯১

উন্নয়ন ও পরিবেশ

এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কাঠামো

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক আছে। এই সম্বন্ধকে ৩টি বর্গ তিন ভাবে দেখেছে, দেখছে। রাষ্ট্র, জনসাধারণ ও পুঁজি এই ৩ বর্গ তাদের দিক থেকে এই সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছে।

রাষ্ট্রের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে ভারত সরকারের পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রকের জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০০৪-এ। বলা হয়েছে উন্নয়ন বিষয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পরিবেশ ভাবনা। স্থায়ী উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে মানুষের মঙ্গল করা যায়। তাই মানুষের মঙ্গল আর পরিবেশ সংযুক্ত বিষয়। উন্নয়নের চাহিদা আর পরিবেশের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই নীতি ঘোষণায় সরকার মনে করিয়ে দিয়েছে, পরিবেশ একটি সাংবিধানিক বিষয়। সংবিধানের ৪৮ (এ) ও ৫১ (এ) ধারায় পরিষ্কার পরিবেশ দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব, পরিষ্কার পরিবেশ পাওয়া নাগরিকদের অধিকার। এই নীতি ঘোষণায় রাষ্ট্র দেখাল সে নাগরিকদের মঙ্গল চায় এবং এইভাবে রাষ্ট্র পরিবেশ বিষয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল।

পরিবেশ বিষয়ে জনভাবনার প্রকাশ প্রধানত ১৯৭০ পরবর্তীকালে। ১৯৭০-এর দশকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধতা তৈরি হচ্ছিল। বিরুদ্ধ ধারণা নির্মাণে তিনটি বিষয় সামনে চলে এসেছিল। নারীবাদী ধারণা, অধিকার ধারণা এবং পরিবেশ ধারণা। উন্নয়নের অর্থনীতির বিরুদ্ধতায় পরিবেশ ধারণা নিয়ে আসা হয়। এটা একটা দিক। অন্য আর একটা দিক, পরিবেশ আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বাইরে গণআন্দোলনের বিষয় করে তোলা এবং আর এক ধাপ এগিয়ে, পরিবেশকে গণ-উদ্যোগের বিষয় হিসাবে দেখা।

পরিবেশ বিষয়ে পুঁজির ধারণা একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক, একরকমের নয়, বহুরকমের। পুঁজি পরিবেশকে দেখেছে বিনিয়োগের, উৎপাদনের রসদের, মুনাফার প্রেক্ষিতে।

এই তিনটি ধারণার মধ্যে আমরা মিল দেখাতে চাইছি একটা বিষয় দিয়ে, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় দিয়ে। ৩টি বর্গ চাইছে পরিবেশ সংরক্ষণ। তিনটি আলাদা কারণে। আমরা এই তিনটি কারণের মধ্যে মিল-অমিল দেখব, দ্বন্দ্ব অনুসন্ধান করব।

রাষ্ট্র তার ধারণায় পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কের মধ্যে উন্নয়নের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হয় স্বীকার করেছে। এই

ক্ষতির একটা বড় কারণ বলেছে দারিদ্র। ফলে পরিবেশ, উন্নয়ন, দারিদ্র এই তিনটে বিষয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিবেশ ও দারিদ্রের মধ্যে এই সম্বন্ধকে আমরা দুই দিক থেকে দেখতে চাইছি। প্রথম দিক জনভাবনার দিক থেকে, যেখানে দেখা হয় পরিবেশ থেকে দারিদ্র। বেঠিক উন্নয়নে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে দারিদ্র ঘটছে এবং এই দারিদ্র সাময়িক নয়, চলমান দারিদ্র। বেঠিক উন্নয়নে, ভুল অর্থনীতিতে জমির উর্বরতার ক্ষয় হচ্ছে, জলের পরিমাণ ও মানের ক্ষতি হচ্ছে। অরণ্যের ক্ষতি হচ্ছে, মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনযাপন এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর, এই সব পরিবেশ উপাদান নির্ভর। যত পরিবেশের ক্ষতি, তত জীবনযাপন উপাদানের ক্ষতি, তত দারিদ্র। সরকার এই ক্ষতি মেনে নেয়। এই ক্ষতি থেকে যে দারিদ্র, তার জন্য দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি নেয় এবং পাশাপাশি সাম্প্রতিক পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করে, গণআন্দোলনের দাবিতে। গণভাবনায় পরিবেশ সংরক্ষণ, জীবনযাপন, রসদ সংরক্ষণ ধারণার সঙ্গে যুক্ত। জীবনযাপন রসদ সংরক্ষণ দারিদ্র প্রতিরোধে।

দ্বিতীয় দিক পুঁজিভাবনার দিক থেকে। যে ভাবনায় দারিদ্রের জন্য পরিবেশের ক্ষতি, যা প্রথম ভাবনার, গণভাবনার বিপরীত। পুঁজির বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফার জন্য রসদ, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজন। সাধারণজনের জীবনযাপনের জন্য এই সম্পদ ব্যবহার করা হয়। দারিদ্রের কারণে এসবের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। জমি, শস্য, জঙ্গল, জ্বালানি, জলাশয়, মাছ এই সবের ব্যবহারে পরিবেশের অবক্ষয় হয়। পরিবেশের অবক্ষয়ে পরিবেশ রসদ ভিত্তিক পুঁজি বিনিয়োগ, উৎপাদন, মুনাফা লাভ ব্যাহত হয়। তাই পুঁজির চাহিদা পরিবেশ সংরক্ষণ।

পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণা দুইটি বিপরীত সূত্র থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। এই দুইটি বিপরীত মুখ থেকে আসা ধারণাকে একমুখী করার, মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। দুইটি বিপরীত ইচ্ছাকে ১-এ প্রকাশিত করার দায় রাষ্ট্রের।

এই মধ্যস্থতার একটি উদাহরণ, সাম্প্রতিক ঘোষিত অরণ্যবাসীর অরণ্যে অধিকার স্বীকৃতির আইন। আমরা এই আইনের ইতিহাসটা খুব ছোট করে বলছি।

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের আগে অরণ্যবাসী মানুষের অরণ্যে বাস করার এবং অরণ্য সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার ছিল। ইংরেজরা এসে এই ব্যবস্থা বদলে দেয়। সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে, যেমন রেলপথ বানাতে অরণ্য সম্পদের দরকার পড়ে। প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে ইংরেজ শাসকরা, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জনগোষ্ঠীর অধিকার অস্বীকার করা হয়। অরণ্যবাসীর অরণ্যে বসবাস এবং অরণ্যসম্পদ জীবনযাপনে ব্যবহারের ওপর নিষেধ আরোপ করা হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে একই সরকারি নীতি।

পুঁজির বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফার জন্য রসদ, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজন। সাধারণজনের জীবনযাপনের জন্য এই সম্পদ ব্যবহার করা হয়। দারিদ্রের কারণে এসবের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আরও কঠিন হয়ে যায়। সংরক্ষিত অরণ্যনীতিতে অরণ্য থেকে, অরণ্যে বসবাস থেকে, অরণ্য সম্পদ ব্যবহার থেকে অরণ্যবাসীদের সরিয়ে দেওয়া এই কৈফিয়তে যে, অরণ্যবাসীদের ব্যবহারে অরণ্যের ক্ষতি, যা কিনা পুঁজির ধারণা। অরণ্য থেকে অরণ্যবাসীর এই উচ্ছেদে অরণ্য সংরক্ষিত হয়নি বরং অরণ্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে। এখন সরকার এই ধারণায় যে, অরণ্য সংরক্ষিত হতে পারে একমাত্র অরণ্যবাসীদের দ্বারাই। অতএব নতুন অরণ্য নীতি। অরণ্যে অরণ্যবাসীদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। অরণ্য সংরক্ষণের তাগিদে। পরিবেশ আন্দোলনের, গণ-আন্দোলনের এটাই দাবি ছিল।

আবার এটা পুঁজিরও দাবি। পুঁজির সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত বিনিয়োগের বড় ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ। পুঁজির সাম্প্রতিক গবেষণা উদ্যোগে উদ্ভাসিত প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক। বিশ্ববাণিজ্য নীতির অন্তর্গত মেধাস্বত্বের অধিকার আইনে এই প্রযুক্তি সুরক্ষিত। পুঁজির কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এখন জরুরি বিষয়। পরিবেশ রক্ষা, তার বিনিয়োগের জন্য, উৎপাদন, মুনাফার জন্য প্রয়োজন।

পরিবেশ নিয়ে জনচাহিদা ও পুঁজি চাহিদার মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এ এক জটিল সম্পর্ক কাঠামো। আমরা এই কাঠামোকে বানানোর চেষ্টা করছি।

পরিবেশ উপাদান হলো জমি, জঙ্গল, জল, উপকূল। এই উপাদানসমূহ জীব বৈচিত্রের আধার। এই জীব বৈচিত্র জনসাধারণের জীবনযাপনের রসদ এবং পুঁজির উৎপাদন রসদও, এবং পুঁজির বিনিয়োগ ভূমি, এবং পুঁজির উৎপাদিত পণ্য যেমন বীজ, শস্য, ওষুধ ইত্যাদির ভূমি। প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে অর্থনীতিক নিয়মে পুঁজির একই সঙ্গে সংরক্ষণ এবং উচ্ছেদ প্রকল্প। যা যা যতটা এবং যতদিন দরকার তা সংরক্ষণ, যা যা দরকার নেই তা উচ্ছেদ।

উচ্ছেদের তালিকায় প্রাকৃতিক বীজ, উদাহরণ সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত বীজ বিল, প্রাকৃতিক শস্য, উদাহরণ সাম্প্রতিক ঘোষিত কৃষক নীতি, প্রাকৃতিক-সামাজিক জ্ঞান, উদাহরণ সাম্প্রতিক ঘোষিত মেধাস্বত্ব অধিকার আইন। পরিবর্তে পুঁজির তৈরি বীজ, শস্য, উৎপাদন-জ্ঞান প্রতিস্থাপন, পুঁজি যা বানাতে পারে তার উচ্ছেদ, তার সংরক্ষণ নয়। পুঁজি যা বানাতে পারে না এবং বানাতে যা কাজে লাগে, যেমন জমি, জল, জঙ্গল, উপকূল, পরিবেশ উপাদান, তা সংরক্ষণ।

অপরদিকে জনচাহিদায় পরিবেশ সংরক্ষণে জমির সঙ্গে বীজ, জলের সঙ্গে শস্য, জঙ্গলের সঙ্গে ওষুধ, উপকূলের সঙ্গে লোকজ্ঞান সবই পরিবেশ উপাদান — প্রাকৃতিক সম্পদ, অতএব সংরক্ষণের বিষয়।

সুতরাং পুঁজির চাহিদায় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জনচাহিদায় পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ উভয় ধারণায় পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কের

চেহারা ও চরিত্রের মধ্যে পার্থক্যেও। জনচাহিদায় পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কে প্রকৃত স্থায়ী উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা। পুঁজির চাহিদায় তা আপাতত স্থায়িত্বের ইচ্ছা হিসাবে প্রকাশিত।

এই দুই ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকায় রাষ্ট্রের অবস্থান। একদিকে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা, অন্যদিকে পুঁজির অর্থনৈতিক ক্ষমতা, মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা।

এই মধ্যস্থতায় পুঁজির হাতে আলোচনা, ক্ষতিপূরণ, নীতি, অনুদান, কর্মসূচি এই সব। আর জনসাধারণের হাতে গণআন্দোলন। কার জোর বেশি, কে কোন্ দিকে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারবে তার উপর নির্ভর করছে পরিবেশ ও উন্নয়নের আগামী সম্বন্ধ। ◘

অনীক পত্রিকা জুন ২০০৮ সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রিত

খাদ্য সংকট ও খাদ্য নিরাপত্তা

ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমাদের দেশে কৃষিনীতিকে একটা সময়কাল ধরে দেখা যায়। ১. সবুজ বিপ্লবের আগে ২. সবুজ বিপ্লবের পরে এবং বর্তমানে ৩. চিরসবুজ বিপ্লব। এম এস স্বামীনাথন তার জমা দেওয়া সাম্প্রতিক কৃষিনীতিতে লিখেছেন "Evergreen Revolution"। অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বাজেটে এটা উল্লেখ করেছেন।

খাদ্য আমরা দুভাবে পেতাম। একটা খাদ্য আমরা চাষ করে পেতাম আর কিছুটা খাদ্য আমরা চাষ না করে পেতাম। যেমন স্থানীয় কিছু গাছপালা, শাকসবজি আপনা থেকেই জন্মায় এবং মানুষ সেগুলোকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এই সব খাদ্যের একটা বিশিষ্টতা আছে। আঞ্চলিকতা অনুসারে বিশিষ্টতা। আঞ্চলিকতা হল শুষ্ক অঞ্চলের খাদ্য, আর্দ্র অঞ্চলের খাদ্য ইত্যাদি। এর ফলে খাদ্যের বৈচিত্রও ছিল।

খাদ্যকে যখন প্রকৃতি থেকে চাষ করে ও কিছুটা চাষ না করে মানুষ পাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা সম্পর্ক। এটা একটা দিক। অন্য একটা দিক বৈষম্য। জমি মালিকানার বৈষম্য, শস্য মালিকানার বৈষম্য। এটার মধ্য দিয়ে আমাদের খাদ্য পাওয়া না পাওয়া নির্ধারিত হয়। সবুজ বিপ্লবের আগে আমাদের দেশ উপনিবেশ ছিল। খাদ্য পাওয়া না পাওয়ার উপর উপনিবেশ অর্থনীতির একটা প্রভাব ছিল। এটাকে ভেতর এবং বাহিরের অর্থনীতি এভাবে দেখা যেতে পারে। বাহিরের চাহিদা যখন তার প্রয়োজন মেটাতে পারেনি তখন ভেতরের অর্থনীতির কাছে এসেছে। বাণিজ্য শস্য যদি বাহিরের চাহিদা আর খাদ্যশস্যকে যদি ভেতরের চাহিদা বলে ধরে নিই, তাহলে দেখা যায় এই দুটোর মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। বাণিজ্য শস্য ও খাদ্যশস্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা পাওয়া না পাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়।

সবুজ বিপ্লবে একটা বাহির এসে ভেতরে ঢুকেছে। বাহির হল জোগান—যেমন বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি। এটাকে ঘরের কৃষি নিয়ে বাহিরের ভাবনা বলে ধরা যেতে পারে। বাহির আগে বাহিরেই ছিল তখন ভিতরকে বদলানোর কথা বলা হয়নি। কিন্তু এখন বাহির ভিতরকে বদলানোর জন্য আসছে। এই বাহিরকে আসতে হয়েছে সরকারি মাধ্যমে। ব্যক্তিগত মাধ্যমে আসতে চাইলে আসতে পারত না।

স্বাধীনতার পর থেকে বাহির সরকারি মাধ্যম দিয়েই এসেছে। কোনো ব্যক্তিগত মাধ্যমের সাহায্যে সে আসেনি। বাহির একটা ধারণা তৈরি করেছে শস্য সম্পর্কে, সরকারি

মাধ্যম সম্পর্কে। বাহির চেয়েছে সরকারি কাঠামোর মধ্য দিয়ে ভেতরের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, দখল করতে।

মানুষ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র খাবার তৈরি করছে, মানুষ খাবার পাচ্ছে আবার পাচ্ছেও না। স্বাদ, গন্ধ নির্ভর করে যে খাবার তৈরি করার বা পাওয়ার কথা সেই খাবার মানুষ পাচ্ছে না। সরকারি খাদ্য পাচ্ছে, কিন্তু গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে যে খাদ্য, তা পাওয়া গেল না। এটা খাদ্য পাওয়া আবার না পাওয়ার অবস্থার কথা। এবার আসা যাক চাহিদার ক্ষেত্রে। কৃষির ক্ষেত্রে বাহিরের চাহিদা তিন ধরনের। উচ্চবর্গের চাহিদা, বাণিজ্য চাহিদা ও শিল্প চাহিদা। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা নাগরিকের জন্য। কৃষির ভিতরের চাহিদা ও বাহিরের চাহিদা এই দায়বদ্ধতাকে প্রভাবিত করতে থাকে। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা থাকে প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া। ১৯৯০ দশক থেকে IMF ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে দিল। তারা যা শর্ত দেবে তা আমাদের মানতে হবে। এল Structural Adjustment Programme (SAP)। International Monetary Fund- যখনই কোনো ঋণ দেয়, তখনই কতগুলো শর্ত থাকে। IMF অর্থনীতির নীতিটাকে monitoring করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। ১৯৯০ দশকে যখন IMF ঋণ দিল, তখন SAP-এর বাধ্যতামূলক কয়েকটি নীতি ছিল। সরকার সরে না গেলে বাজার মুক্ত হয় না। বিশ্ব পুঁজির অবাধ বাজার দরকার। তার মাল ফেলার জায়গার দরকার। Insurance Policy, Export-Import Policy, Capital Policy প্রত্যেকটা SAP কে follow করছে। সরকারকে সরে যেতে হবে। প্রত্যেকটা জিনিস পণ্য। প্রত্যেকটা জিনিস কেনাবেচার বিষয়। প্রত্যেকটা মানুষ ক্রেতা- বিক্রেতা।

এই programme টি বলল রাষ্ট্রের কাঠামোটাই বদলে দাও। রাষ্ট্র কাঠামো বদলের মধ্য দিয়েই তারা ভেতরের চাহিদাকে গ্রাস করার চেষ্টা করল। এই programme ধরার চেষ্টা করল খাদ্য বা কৃষি বা চাষকে। আমাদের লোকরীতি অনুযায়ী, স্বাদ-গন্ধ অনুযায়ী খাদ্যকে আর রাখল না। তারা ঠিক করল কী খাদ্য তৈরি হবে। বাইরের চাহিদা অনুযায়ী খাবার তৈরি হতে থাকল। উদাহরণ হল আফ্রিকা। ওখানে মাঠের পর মাঠ সেইসব চাষই হচ্ছে, যা বাণিজ্য সংস্থাগুলি চাষ করতে বলছে। দেখা গেল ছোট চাষি আর চাষ করতে পারল না, তারা চাষ ছেড়ে চলে যেতে থাকল। ছোট চাষি চলে যাওয়া মানে ছোট জোত চলে যাওয়া। বড় জোত জায়গা দখল করতে থাকল। রাষ্ট্র আর কম উৎপাদনশীল ছোট জোতের চাষিকে ভর্তুকি দিয়ে রাখল না। বড় চাষি, বড় জোতকেই সে বেছে নিল। এই বড় চাষির আসা ও ছোট চাষির চলে যাওয়া দেশের খাদ্য বানানো ও খাদ্য বন্টন ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনল। নূতন কৃষির ধারণায় ছোট চাষি উৎপাদকের ভূমিকা থেকে অনুৎপাদক হয়ে গেল, ছোট চাষি খেতমজুর হয়ে গেল। যত চাষি খেতমজুর হয়ে যেতে থাকল ততই তাদের খাদ্য না পাওয়ার অবস্থা বাড়তে থাকল।

বড় চাষির ক্ষেত্রে দেখা গেল সে খাবার বানাতে পারে, নাও পারে। যদি বড় চাষি

International Monetary Fund- যখনই কোনো ঋণ দেয়, তখনই কতগুলো শর্ত থাকে। IMF অর্থনীতির নীতিটাকে monitoring করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়

খাবার বানায় তাহলে কী হবে? এখানে জানতে হবে যদি বাজারকে মানি, যদি বাজারের মাধ্যমে শস্য নির্ধারণ হবে এটা মানি, তাহলে দেখা যাবে বাজারটা আর ব্লকের মধ্যে, গ্রামের মধ্যে, রাজ্যের মধ্যে নয়, কৃষি বাজারটা অনেক বড়, এমনকি ভারতের বাইরে। বাজারই নির্ধারণ করে দেবে কী শস্য মানুষ চাষ করবে, কিন্তু বাজারটা কোথায় সে তা জানে না। বাজারটা আমেরিকা হতে পারে, জাপান হতে পারে, কলকাতা হতে পারে এবং যদি চাষের মূল লক্ষ্য হয় মুনাফা তৈরি করা, তাহলে বড় চাষি সেই চাষটাই করবে যেটা মুনাফা এনে দেবে। মুনাফা কোথা থেকে আসবে? বাজার থেকে। বাজার তাকে যা চাষ করতে বলবে সে সেটাই চাষ করবে। আসলে ভিতরের চাহিদা অনুসারে চাষ হচ্ছে না। বাইরের থেকে যে চাহিদা আসবে, বাইরের বাজার যে চাষ করতে বলবে, সেই চাষ হবে। সেই চাহিদা উচ্চবর্গের হতে পারে, যেমন কলকাতা শহরের বাবুরা যারা Shopping Mall থেকে খাবার কেনে বা বড় বড় বাজার থেকে জিনিস কেনে। বিদেশ হতে পারে, কিংবা শিল্প পুঁজি যেমন ITC, Reliance ইত্যাদি। যেখানে খাবার সরাসরি মাঠ থেকে ক্রেতাদের হাতে পৌঁছোয় না। নানা হাত ঘুরে আসে। কারখানা ঘুরে আসে, Processing Unit ঘুরে আসে। এই ঘুরিয়ে আনতে চায় যারা, খাবারটা তাদের হাতেই চলে যায়। এই তিন জায়গা থেকে খাবারটা যদি ঘুরে আসে তাহলে এখানে নেই নিম্নবর্গরা—যেমন ছোট চাষি, গ্রামের গরিব খেতমজুর যারা কিনা সংখ্যায় বেশি, যাদের বাজারে প্রবেশ করার জায়গা নেই। এইখানে দাঁড়িয়ে নীতি নির্ধারকরা যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা হল যে, আমাদের ওইভাবে ভেতর–বাহির বলে কোনো গল্প নেই। বিশ্ববাজার–নীতি একটাই। পৃথিবী একটা। বাজার একটা। কৃষি জমি একটা। ফলে ওইভাবে ভিতর বাহির বলে কোনো কথার মানে হয় না। যেখানে ধান পাওয়া যায় সহজে, সেখান থেকে বেশি ধান আসবে। আর যেখানে টম্যাটো করা লাভজনক, সেখানে টম্যাটো করা হবে। ধান আর টম্যাটো একই জায়গায় কেন করতে হবে? কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে আমার খাবারটা ধান, টম্যাটো নয়। আসলে ধান সরে গিয়ে টম্যাটো আসতে পারে। প্রশ্নটা হল ITC আমাদের ধান খাওয়াবে কি না খাওয়াবে, বীজ কোম্পানি ধানের বীজ করবে কি করবে না, সার কোম্পানি ধানের জন্য সার বানাবে কি বানাবে না, তার ওপর নির্ভর করছে ধান চাষ হবে কি হবে না। খাদ্য বলতে কি বোঝায় সেই ধারণাটাই বদলে গেল। খাদ্যের সংজ্ঞাটাই বদলে গেল। আমরা যা খেতে চাই সেটা খাবার, না যেটা ওরা খাওয়াতে চায় সেটাই খাবার। এখানে একটা দ্বন্দ্ব এসে গেল। আমি যেটা খাব সেটা খাদ্য নাও হতে পারে। ধানটা খাবার, গমটা খাবার, রুটিটা খাবার, এগুলো খাবার কে বলে দিল। এখন তো আর ভিতর নির্ধারণ করছে না। ভিতরটা তো ভেঙে গিয়েছে। তাকে তো অস্বীকার করা হয়েছে। তাহলে মেদিনীপুর তো আর বলার কেউ নয় যে মেদিনীপুর চাল খেতে

চায়। বীরভূম তো আর বলার কেউ নয় যে বীরভূম চিঁড়ে খেতে চায়। এ কথা বলার আর কোনও মানে হয় না। সমস্ত শস্য পণ্য হয়ে যাবে এবং বাজার দ্বারা নির্ধারিত হবে তার মুনাফা। সেটাই খাদ্য, যা মুনাফা তৈরি করতে পারে।

যে ধারণাগুলো নিয়ে বাজার, ক্রেতা, মুনাফা ইত্যাদি বলছি সেই ধারণাগুলো বদলে যাচ্ছে। এগুলো আমাদের চিরাচরিত ভাবনা, ধারণা, তর্কের বিষয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে। নতুন তর্কের বিষয়কে আনা হচ্ছে। সেখান থেকে কৃষিনীতিকে, অর্থনীতিকে, খাদ্যব্যবস্থাকে, খাদ্য পাওয়া না পাওয়াকে ধরতে হচ্ছে।

উচ্চবর্গের খাবারটাই খাবার। সে কী চাইছে? সে আর শস্য চাইছে না। সে অনেক বেশি প্রাণীজ খাবার চাইছে। কারোর চাহিদা কেউ নিজে করে, না কি কেউ বলে দেয় তার চাহিদা করার দরকার। কেউ নিজে মাংস খেতে চেয়েছে, নাকি মাংস উৎপাদক যারা, তারা বলছে মাংস না খেলে জীবন অর্থহীন। এখানে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞাপন। এটা বিপণন ব্যবস্থা। তারা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বুঝিয়ে যাচ্ছে চালটা খাবার নয়, মাংসটা যথার্থ খাবার। এই মাংস খাওয়াটা আমি যত বেশি মেনে নেব, তত বেশি মাংস তৈরি করতে যে শস্য লাগে, খাদ্যশস্যকে উচ্ছেদ করে সেই শস্যটার চাষ হবে। তাহলে আমাকে কী খেতে বলা হচ্ছে, আমি কী খেতে চাহিদা তৈরি করছি, উচ্ছেদ করছে আরেকজনের খেতে চাওয়ার বিষয়টাকে। যত বেশি প্রাণীজ খাদ্য চাইব, তত বেশি প্রাণীজ খাদ্যের জন্য শস্য চাষ হবে। বাজারে তখন ওই প্রাণীজ খাদ্যের জন্য শস্যের চাহিদা বেশি, তার থেকে মুনাফা বেশি। মানুষের খাদ্যশস্য অপেক্ষা ওই শস্যে মুনাফা বেশি।

জলাশয়, সমুদ্র উপকূল ও বনাঞ্চল থেকে যে খাদ্য পাওয়া যেত, তাও আজ পণ্য করা হচ্ছে। যত বেশি সমুদ্র, জলাশয় ও বনকে পণ্য করা হয়েছে, তত মুনাফা তৈরির গল্প হয়েছে। সেখান থেকে পাওয়া স্বাভাবিক খাবারগুলি নষ্ট করা হয়েছে, ফলে ওই সকল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের খাদ্যের অভাব তৈরি হয়েছে। উৎপাদন না করে খাবার গল্পটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

স্বামীনাথন কমিটির নূতন রিপোর্টে যে তিনটি চাষ-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা হল — ১. চুক্তি চাষ ২. কোম্পানি চাষ ৩. কর্পোরেট চাষ

চুক্তি চাষ সেই চাষ নয় যা চাষি করতে চায়। এটা সেই চাষ নয়, যা সাধারণ মানুষ খাবার করার জন্য করতে চায়। এটা সেই চাষ যা বাহির এসে বলছে আমার এটা দরকার তুমি চাষ করো। চুক্তি করো আমার সঙ্গে। কীসের চুক্তি—বাইরের চাহিদা আছে, তুমি জোগান দাও। আগে ছিল ভেতরের চাহিদা ভেতরের জোগানের ভারসাম্য। এখন বাইরের চাহিদা ভেতরের জোগান। বাহির গিয়ে বলছে আমায় এটা বানিয়ে দাও।

শুধু আজকে বানিয়ে দিও না, আজকে দাও, কালকে দাও, আগামী পাঁচ বছর ধরে

চুক্তি চাষ সেই চাষ নয় যা চাষি করতে চায়। এটা সেই চাষ নয়, যা সাধারণ মানুষ খাবার করার জন্য করতে চায়। এটা সেই চাষ যা বাহির এসে বলছে আমার এটা দরকার তুমি চাষ করো। চুক্তি করো আমার সঙ্গে।

বানিয়ে দাও। যেমন রিলায়েন্স যা করবে, ওয়ালমার্ট বা মেট্রো যা বানাতে বলবে, সেটাই বানানো হবে। এই পাঁচ বছরের বানানোতে সেটা নেই, যা আমাদের স্থানীয় খাদ্য। ধান নয়, গম নয়, রাগি নয়, জোয়ার নয়, বাজরা নয়, দানাশস্য নয়। সেটাই চাইবে যা থেকে মুনাফা লাভ হবে, যা উচ্চবর্গের লোকেরা শপিং মল থেকে কিনবে, যা বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, যা শিল্প চাইবে, খাদ্য-শিল্প চাইবে। আজকের এই পৃথিবীতে একটা বড় জায়গা উঠে এল তা হল খাদ্য-শিল্প। খাদ্য নয়, খাদ্য-ব্যবস্থা নয়, খাদ্য-শিল্প বা ফুড ইন্ডাস্ট্রি।

ফুড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যোগ দিল অত্যন্ত শক্তিশালী Food Trade Corporation। বহুজাতিক সংস্থা। প্রত্যেকটা শস্যের পাঁচটা থেকে ছয়টা Global Farm আছে, যারা সারা পৃথিবীর খাদ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের আজকের ধানটা কম ফলেছে, আমরা ভিয়েতনামকে বললাম যে ধান দেবে, এভাবে ধান পাওয়া যায় না। মেক্সিকোকে বললাম গম দেবে, এমনভাবে আজ আর গম পাওয়া যায় না। আগামী পাঁচ বছরের মেক্সিকোর গম কিনে ফেলেছে বহুজাতিক শস্য বাণিজ্য সংস্থা, তাদের থেকে গম বা ধান আমাদের কিনতে হবে। সেটা আবার আমাদের দামে নয়।

এবার অন্যদিক থেকে ব্যাপারটা ধরার চেষ্টা করছি। যেমন, চাহিদা মানে কী? জোগান থাকলেই কি চাহিদা আছে? অনেক সময় দেখা যায় চাহিদা আছে কিন্তু জোগান নেই, আবার জোগান আছে চাহিদা নেই। তাহলে চাহিদা মানে হল একটা চাওয়া। যেমন আমি ধান চাইছি, মনে রাখতে হবে তা গণবণ্টন ব্যবস্থায় চাইছি না। সরকার রেশনে বিনা পয়সায় দেবে এটা চাইছি না। আমার কাছে অর্থ আছে। আমি তা খরচ করব চাহিদার জন্য। অর্থ থাকলে আমি দাম দিতে পারব, অর্থাৎ চাহিদাকে আমি দামে রূপান্তরিত করলাম। আমি ব্যয় করলাম। অর্থাৎ আমার কাছে টাকা আছে আমি দাম দিলাম। দাম দিলাম মানে খরচ করলাম। খরচ করলাম কারণ আমার আয় আছে। তাহলে জরুরি হল আয়। চাহিদা কথাটার কোনো মানে হয় না, মানে হয় আয়ের। চাহিদা হল দুরকমের। একটা হচ্ছে সত্যি সত্যি চাহিদা। অর্থাৎ একজনের প্রতিদিন ১ কেজি চালের চাহিদা আছে। সেটা প্রকৃত চাহিদা। কিন্তু সেই ১ কেজি চালের দাম মেটানোর মতো তার আয় নেই। ফলে তার প্রকৃত চাহিদা মেটানো হল না। আর একটি হল প্রত্যক্ষ চাহিদা। প্রত্যক্ষ চাহিদা হল যদি কেউ বাজারে গিয়ে ৫০০ গ্রাম চাল কিনে আনে। বাজারে সে সত্যি সত্যি ৫০০ গ্রাম চাহিদা তৈরি করতে পারল, আসলে তার করা উচিত ছিল ১ কেজি। আয়টা কীসের উপর নির্ভর করবে? কর্মসংস্থানের উপর। সত্যি সত্যি চাহিদা নির্ভর করবে কর্মসংস্থানের উপরে বা জমির মালিকানার উপর। যত জমির মালিকানা কমে যাবে তত আয় কমে যাবে। যত আয় কমে যাবে তত ব্যয় করার ক্ষমতা কমে যাবে। যত ব্যয় করার ক্ষমতা কমে যাবে তত চাহিদা কমে যাবে। প্রকৃত চাহিদা থাকলেও প্রত্যক্ষ চাহিদা কমে যাবে। যত

আয় করার ক্ষমতা কমবে তত চাহিদা করার ক্ষমতা কমবে। চাহিদা কমার অর্থ হল কম খেয়ে থাকা। কম খেয়ে থাকার অর্থ আসলে কম খাবার পাওয়া। সরকার বলছে সবই তো পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রেশন দোকানে। চাল কেন কিনছে না দোকান থেকে, বাজারে তো চাল পাওয়া যাচ্ছে। কে বলেছে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না, অনাহারে থাকছে মানুষ। এই তো খাদ্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অমুক জায়গায়, তমুক জায়গায়। এটা ঠিক নয়। আমরা বলব ওটা সরকার পাঠালেও খাবার পাওয়া নয়। খাবার পাওয়া হচ্ছে, বাজারে গিয়ে কতটা পরিমাণ চাল আনতে পারা গেল। তার প্রয়োজনের থেকে যদি কম খাবার আনে ওটা খাবার না পাওয়ারই সমান গণ্য হবে। অর্থাৎ প্রকৃত চাহিদাটা জরুরি, প্রত্যক্ষ চাহিদাটা নয়। খাবার পাওয়াটার সঙ্গে জুড়ছে আয় করাটা, জমির মালিকানাটা। যার জমির মালিকানা নেই, যার আয় নেই, সে না খেয়ে আছে, খাদ্যাভাবেই আছে। আমরা বিষয়গুলোকে টুকরো টুকরো করে দেখি। খাবার পাওয়াটা একটা আলাদা বিষয়, তার সঙ্গে আয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। জমির মালিকানা একটা আলাদা বিষয়, তার সঙ্গে খাবার পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। খাবার পাওয়া নিয়ে আলোচনা করি। কত পরিমাণ গম কোথায় পৌঁছল, সরকার তো পাঠিয়ে দিয়েছে — এসব বলতে শুরু করি। বলি খাদ্য উদ্বৃত্ত। পশ্চিমবাংলায় এই এত ধান উদ্বৃত্ত পড়ে আছে, লোকে কি কিনতে পেরেছে? তার যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন ছিল তা কি সত্যি সত্যি সে কিনতে পেরেছে? তাহলে খাদ্যাভাব নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি, তখন আয়ের অভাব নিয়েই আমরা আলোচনা করছি, জমি-মালিকানার অভাব নিয়ে আলোচনা করছি। এই দুটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এরপর ব্যয়ের বিষয়ে কথা বলব। আয় আছে তবু চাহিদা নেই। মানুষ তার আয়ের থেকে, খাদ্যের চাহিদা তৈরি করার মতো ব্যয়টা করতে পারছে কিনা। তার আয় আছে, কর্মসংস্থান আছে, জমির মালিকানা আছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাজারে গিয়ে সে চালটা আনতে পারছে না। কেন? কারণটা কি? ধরা যাক তার অসুখ করেছে। গ্রামে চিকিৎসা-ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসা করতে চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে যায়। চিকিৎসার জন্য ব্যয় বেড়ে গেল মানে, খাদ্যের জন্য আয় কমে গেল। মানে কম খাদ্য খাচ্ছে। মানে কম পুষ্টি হচ্ছে। কম পুষ্টি হচ্ছে মানে আবার অসুখ করছে। আবার চিকিৎসা বাড়ছে। অর্থাৎ খাদ্য-চাহিদাটা খাদ্য পাওয়া না পাওয়া থেকে কোনো আলাদা বিষয় নয়। এটার একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। যেমন শিক্ষাখাতে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে খাওয়ার জন্য যে আয় তা কমে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদের গ্রামের গরিবদের সম্বন্ধে লেখা একটা বইতে বলা হয়েছে, পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাখাতে খরচ বেড়ে গিয়েছে। যদি আয় না বাড়ে, অথচ শিক্ষাখাতে খরচ বেড়ে যায়, চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যয় বেড়ে যায়, তাহলে খাদ্য-খাতে ব্যয় কমে যাবে। অর্থাৎ খাদ্যের অভাব। আমি খাচ্ছি না। খাদ্যের অভাবটা শুধু খাদ্য পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নয়। খাবার বাড়িতে নিয়ে আসার প্রশ্ন। যত বেশি বাজারে ঠেলা হবে তত বেশি আয়ের প্রশ্নটা উঠবে। যতক্ষণ বাজার ছিল

আমরা বিষয়গুলোকে টুকরো টুকরো করে দেখি। খাবার পাওয়াটা একটা আলাদা বিষয়, তার সঙ্গে আয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। জমির মালিকানা একটা আলাদা বিষয়, তার সঙ্গে খাবার পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই

না, ততক্ষণ এই প্রশ্নটা তোলা হয়নি — যত বেশি তাকে না-বাজার থেকে বাজারের দিকে ঠেলা হবে, তত আয়-ব্যয়ের অঙ্কটার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

দেখা যাক আয় বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে আয়, জাতীয় আয় আমাদের এখানে বাড়ছে। আসলে আমাদের এখানে খাবার পাওয়া আছে আবার না-পাওয়াও আছে। আয় বাড়াও আছে, আবার না বাড়াও আছে। ব্যয় করাও আছে, না করাও আছে। এখানে একটা তর্ক থাকে ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে। একটা ভারত বলে কিছু হয় না। ভারতে এখন বার্ষিক আয় এত পরিমাণ, ভারতে এখন মাথাপিছু খাদ্যের চাহিদা এত পরিমাণ — এই কথাটার কোনও মানে হয় না। কেননা একটা ভারত হয় না। গড় হিসেবে কিছু হতে পারে না। এতগুলো স্তর আছে ভারতে, এত পার্থক্য আছে ভারতে। আয়ের পার্থক্য, ব্যয়ের পার্থক্য, খাদ্য পাওয়া না-পাওয়ার পার্থক্য, তার যে বৈষম্য সেটা নিয়ে ভাবার দরকার আছে। অর্থাৎ আমরা বলব আঠেরোটা ভারত আছে, আঠেরো রকমের আয় আছে, আঠেরোটা চাহিদা আছে। এই তর্কটা নিয়ে অন্তত ভাববার দরকার আছে। একদল বেশি আয় করে, একদল কম আয় করে। যারা বেশি আয় করে তারা বেশি চাহিদা করে। তারা কোন্ ধরনের খাদ্যের চাহিদা করছে এটা জানা খুব জরুরি। তারা খাবার পাচ্ছে। তাদের খাবার পাওয়াটা বিশেষ ধরনের খাবার পাওয়া। তাহলে খাবার কথাটাকে ভাগ করছি। যেমন আয়কে ভাগ করছি, ব্যয়কে ভাগ করছি, তেমনি খাবার এই কথাটাকেও ভাগ করছি। আসলে খাবার বলে কোনো কথা হয় না। একদলের খাবার, অন্য দলের খাবার অর্থাৎ গ্রামের মানুষের খাবার, শহরের মানুষের খাবার এইভাবে কথাটা বলা দরকার। এর মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। যদি উচ্চবর্গের জন্য খাবার বানাতে হয়, তাহলে নিম্নবর্গের খাবার বানাচ্ছে যারা তাদের সরিয়ে দিচ্ছি। দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। দুটো আয় একসঙ্গে হতে পারে না। বড় আয় হলে ছোট আয়কে সরিয়ে দিতে হবে। বড় চাহিদা মানে ছোট চাহিদাকে সরিয়ে দেওয়া। বড়দের খাবারের চাহিদা যদি তৈরি করা হয়, তাহলে ছোটদের খাবারের চাহিদা সরিয়ে দেওয়া হবে। এটা একসঙ্গে থাকতে পারে না, সেটা আমাদের আলোচনার আগের অংশে দেখেছি। বড়দের জন্য খাবারের যদি চাষ করতে হয় এবং তার যদি জমি লাগে, সেখানে ছোটদের শস্যের চাষের জমিটাকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে বা সেই শস্যটাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ বড়টা দাম বেশি পাবে, মুনাফা বেশি হবে। এই লোকগুলো টাকাটা দিতে পারবে, দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ভারতের ১০ ভাগ লোক যে চাহিদাটা করবে যথেষ্ট মুনাফা সেখান থেকেই হবে। ১০ ভাগের চাহিদার পরিমাণ, আয়ের পরিমাণ, ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি, ফলে ১০ ভাগকে জোগান দিলেই যথেষ্ট মুনাফা হয়ে যাবে। ৯০ ভাগকে না খাওয়ালেও চলবে। ফারাকটা এতই মারাত্মক। ভারতের আয় বৃদ্ধি, ভারতের অগ্রগতি, উৎপাদন বৃদ্ধি এই গল্পটার মধ্যে ১০ আর ৯০-র গল্পটা আছে এবং ১০ আর ৯০ একসঙ্গে থাকতে পারে না। ১০ কে দিয়ে ৯০ কে দেওয়া যাবে

না। ১০ কে দিলে যদি সন্তুষ্ট হওয়া যায়, তাহলে ৯০ কে না দিলেও হবে। সেটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চলতে পারে না। রাষ্ট্রের ৯০ ভাগকে দেখতে হবে, দিতে হবে। পুঁজিকে ৯০ ভাগকে না দেখলেও চলে। রাষ্ট্রর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্র ১০ কে খাওয়াবে, ৯০ কে খাওয়াবে না এটা রাষ্ট্র প্রকল্পে সম্ভব ছিল না। ৯০ দশকের আগে রাষ্ট্রের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। ৯০ দশকের পরে রাষ্ট্রের এই দায়দায়িত্বও আর রইল না। আসলে যেটা বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা হল, এটা একটা সামগ্রিক খাদ্য সংকট নয়। একদল লোক সত্যিই তো খাচ্ছে। এটা একটা বিশেষ ধরনের খাদ্য সংকট। এটা বৈষম্যমূলক খাদ্য সংকট। এটা এক শ্রেণির মানুষের খাদ্য সংকট। এটা কেন চলতে থাকতে পারে? এই যে বৈষম্যের অর্থনীতি একটা দেখা যাচ্ছে। এটা চলছে কেন? কারণ যখন আয় তৈরিতে বৈষম্য আনা হচ্ছে, আয় বন্টনে বৈষম্য আনা হচ্ছে, উচ্চবর্গ, নিম্নবর্গ তৈরি করা হচ্ছে, তখনই উচ্চবর্গের ক্ষমতাটাকে আমাদের বুঝতে হবে। এঁরাই হচ্ছে নীতি নির্ধারক, এঁরাই হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন, এঁরাই মন্ত্রিত্বে আছেন, এঁরাই এগ্রিকালচারাল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে বসে আছেন, এরাই প্রয়োগ করছেন। রাজনীতিটা এদের হাতেই থাকছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নীতি নির্ধারণের, নীতি নির্মাণের, নীতি প্রয়োগের রাজনীতিটা উচ্চবর্গের হাতে থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাটাই বিরাজ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নবর্গ, তাদের রাজনীতি দিয়ে পাল্টা রাজনীতি প্রয়োগ করবে, ততক্ষণ এটা পাল্টাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই খাবার পাওয়া না পাওয়ার গল্পটা আসলে আর সত্যি সত্যি অর্থনীতির গল্প নয়। এটা এখন রাজনীতির গল্প।

এবার যে বিষয়টা বা ধারণাটা রাখতে চাইছি সেটা নিয়ে তর্ক আছে, তর্ক করার দরকার আছে। যে কোনো দেশে যাঁরা অর্থনীতি বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেন বা করতে বাধ্য হন, বা না করে উপায় থাকে না তাঁদের মতে আজকের অর্থনীতিটা পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য নীতি দ্বারা। বিশ্ব বাণিজ্য নীতির মধ্যে একটা কৃষি সংক্রান্ত নীতি আছে। সেটাতে যাবার আগে একটা বড় জায়গা আমাদের মনে রাখতে হবে, সেটা হল উদারীকরণ --- কথাটার মানে হচ্ছে বাণিজ্য-উদারীকরণ। আমাদের মতো দেশ যারা সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ছিল, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীন হয়েছিল, স্বাধীনতার পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই করার মানসিকতা থেকে, তারা এমন একটা অর্থনীতি বানাতে চেয়েছিল, যেটা মোটামুটি স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিদেশের প্রতিযোগিতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। এই ধারণাগুলো থেকে আমরা কতগুলো প্রতিরক্ষা তৈরি করেছিলাম। নীতি দিয়ে করেছিলাম। বাণিজ্যে কতগুলো বাধা তৈরি করেছিলাম। যদি উৎপাদন বাইরে থেকে এসে পৌঁছায়, তাহলে আমাদের দেশে উৎপাদন ব্যাহত হবে, আমাদের দেশে কর্মসংস্থান ব্যাহত হবে। সেইজন্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতগুলো ধারা আমরা তৈরি করেছিলাম। পণ্য আসা ও পণ্য যাওয়া দুদিক দিয়ে।

এঁরাই (উচ্চবর্গ) হচ্ছে নীতি নির্ধারক, এঁরাই হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন, এঁরাই মন্ত্রিত্বে আছেন, এঁরাই এগ্রিকালচারাল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে বসে আছেন, এরাই প্রয়োগ করছেন। রাজনীতিটা এদের হাতেই থাকছে

ফলে যারা বাইরে অনেক উৎপাদন করছে এবং বাজারে বিক্রি করতে চাইছে তাদের অনেক অসুবিধা হল। এই ধারাগুলো তুলে দিল এবং বাজারটাকে উন্মুক্ত করে দিল। বাজারে পণ্য আনা ও নেওয়ার ওপর কোনো বিধিনিষেধ থাকল না। সেটা ঘরের মধ্যে বাজারের ওপর আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকবে না। সেটা বাইরের বাজারের ক্ষেত্রেও থাকবে না। অর্থাৎ পণ্য আনা নেওয়ার কোনো বাধানিষেধ থাকবে না। ফলে আমাদের অসুবিধা হতে পারে, কারণ আমাদের সরকারের আর বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। যদি আমাদের দেশে কোনো শস্য ধান বা গম, যা ঘরের চাহিদার জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যদি সেটার জন্য ঘরের বাজারের দামের থেকে বাইরে বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে কাউকে বাধ্য করা চলবে না যে, এটাকে ঘরেই রেখে দিতে হবে। যদি বাইরের কোনো শস্য আমার দেশে ঢুকতে চায় তা হলে, তাকেও বাধা দেওয়া চলবে না। এতে অসুবিধাটা কোথায়? প্রথম যে অসুবিধাটা ঘটবে তা হল একটা অনিশ্চয়তার গল্প তৈরি হবে। যেহেতু বাইরের দামটা ভেতরের হাতে নেই, বাইরের পরিমাণটাও ভেতরের হাতে নেই, ফলে বাইরের বিষয়-আশয়ে ঘরকে সাজানোটাও অনিশ্চিত হবে। বলতে পারি ধান নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কারণ বাইরে ধান পাওয়া যায়, গম নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কারণ বাইরে গম পাওয়া যায়, কিন্তু কখন কোন্ দামে কতটা পরিমাণ ধান বা গম পাওয়া যাবে সেটা আমার হাতে নেই। ফলে খাদ্যে একটা অনিশ্চয় ব্যবস্থা থাকবে, আমার দেশের এত মানুষকে রোজ খাওয়াতে হবে, এটা নিশ্চয়তার অঙ্ক। এটা থাকে না। যে মুহূর্তে বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং যার নিয়মনীতিটা আমার হাতে নেই অন্যের হাতে, তাহলে যদি মেনে নিই সরকার সকলকে খেতে দেবে বিনা পয়সায়, ঠিকঠাক খেতে দেবে, তাহলেও নিশ্চয়তা হয় না। যে ব্যাপারটাতে সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত হওয়ার দরকার ছিল, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, তার বেঁচে থাকার প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, সেটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকছে। খাদ্য পাওয়াটা অনিশ্চয় হয়ে যাচ্ছে। আমি খেতে পাব কি পাব না এটা আমরা কেউ জানি না। আমি জানি না, সরকারও জানে না, বাজারও জানে না। কোন্ দিন কোথায়, কখন, কতটা ধান উৎপাদন হবে– মিয়ানামার বা ভিয়েতনামে সেটাও অনিশ্চয়তা। ওখানে সুনামি হবে কি না, ওখানে ভূমিকম্প হবে কি না, ওখানে মহামারি হবে কি না সেটা তো আমাদের হাতে নেই, অথচ আমার খাবার তাদের হাতে। এই দ্বন্দ্বটা উঠে আসে যা খুব জরুরি। আলোচনার প্রথমে বলেছিলাম অভ্যন্তরীণ বিষয় খুব জরুরি। চাহিদা ও জোগানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা খুব জরুরি। এই অভ্যন্তরীণের জোগান-চাহিদাটা বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তের জন্য খুব জরুরি ছিল। সেটা তারা ভেঙে দিয়েছে। আমাদের প্রায়ই বলা হয় খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে। ভারতের লোকেরা কী না খেয়ে আছে? তাহলে খাদ্যাভাব কোথায়?

—— হয়তো খাদ্য নিরাপত্তা আছে। কিন্তু সেটা প্রকৃত খাদ্য নিরাপত্তা নয়। খাদ্যের

সার্বভৌমত্বের ধারণাকে এখানে আনতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। খাদ্যে নিরাপত্তা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, খাদ্যে সার্বভৌমত্ব -- তিনটে আলাদা শব্দ। আমি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও আমার খাদ্য নিরাপত্তা না থাকতে পারে। যখন ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তখনও অনেক মানুষ না খেয়ে ছিল, খাদ্য নিরাপত্তা ছিল না। খাদ্য নিরাপত্তা হয়তো আছে, খাদ্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে, সার্বভৌমত্ব নেই। আমার খাবারটা আর আমার খাবার নেই। এটাই সবচেয়ে জরুরি। তর্কটা আমাদের আনতে হবে খাদ্যের সার্বভৌমত্বের জায়গাটাতে। এটা আমার হাতে আছে। আমার খাদ্য, পানীয় জল আমার হাতে আছে। এটা বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে, গরিব মানুষদের গণবন্টন ব্যবস্থায় কী একটা করেছে, যেখানে দামটাম কমিয়ে জিনিস দেবে, মানুষ জিনিস পাবে। তর্কটা এই জায়গায় আনতে হবে। ধরা হচ্ছে না মূল বিষয়টিকে। তার পারিপার্শ্বিকতাকে ধরা হচ্ছে। এখানের খাবার এখানেই তৈরি করতে হবে, এই তর্কটাকে আর তর্ক বলা হচ্ছে না। তর্কটা হচ্ছে খাবার তুমি পাচ্ছ কি পাচ্ছ না। আমি তো তোমাকে দিচ্ছি এনে। খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তার মূল জায়গাটা, খাদ্য উৎপাদনে সরকার কতটা সহায়তা করছে, সেটা কিন্তু দেখা হচ্ছে না। সরকার খাদ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করছে। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? খুব জরুরি একটা পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে সরকার এখনকার বা কালকের খাবার পাওয়াটা করে দিচ্ছে। কিন্তু যদি উৎপাদনের জায়গা না করে দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে খাদ্য পাওয়াটা নিশ্চিত হয় না, অনিশ্চয়তা থাকে। তর্কটা এই জায়গায় আনতে হবে। আসলে সরকার কালকে খাবার পাওয়াটা ঠিক করে দিচ্ছে কিন্তু পরশু পাব কি না, এটা নিশ্চিত হয় যদি সরকার উৎপাদনে intervene করে। সরকার উৎপাদনের সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছে না, ভর্তুকি তুলে নিচ্ছে, ছোট চাষিকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে না, জলসেচের ব্যবস্থা করছে না, বীজের নিশ্চয়তা আনছে না, সরকার বলছে খাবারটা কালকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু পরশু, তার পরের দিন তার পরের দিন--তর্কটা এখানে। কেন আমরা বলছি খাদ্য নিরাপত্তা। এটা ঠিক যে আমরা কাল খাবার পাচ্ছি, সরকার খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। ২ টাকা করে চালটা হয়তো কাল পেয়ে যাবে মানুষ। কিন্তু সার্বভৌমত্বটা? এটা মনে হয়েছে, কালকে কী খাবার দেবে, কখন দেবে, কতটা দেবে, কত দামে দেবে, কাদের জন্য দেবে, কিছুই জানি না। কারণ এগুলো মানুষের হাতে নেই। বন্টনটা সরকার নিয়ে নিয়েছে। প্রশ্নটা আসলে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট, আজকের খাদ্য সংকট নয়, ভবিষ্যৎ খাদ্য সংকট। আমাদের ভাবনাগুলো বা তর্কগুলোকে এই জায়গা থেকে সাজাতে হবে। ◘

ডিআরসিএসসি-র বোসপুকুর অফিসে ৪ আগস্ট, ২০০৮-এ আয়োজিত আলোচনা সভার সভাকথনের লিখনরূপ।

অনুলিখন : **শুক্লা দেব (মিত্র)**

গ্রাম-শহর বনাধিকার

অনিকেত সেনগুপ্ত

আমরা যারা শহরে থাকি তাদের বন নিয়ে আলাদা কোনো ভাবনা নেই। বন আমাদের সেভাবে আলোচনার বিষয় নয়। বন নিয়ে আমাদের কেবল দু-একটা মত আছে। যেমন বন থাকা ভালো, বন থাকলে পরিবেশ ভালো থাকে বা বন থাকলে– গাছ থাকলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমবে ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বনের সঙ্গে জৈব বৈচিত্র রক্ষার কথাও বলি। আমাদের কাছে বন অনেকটা তরাই-ডুয়ার্স-অযোধ্যা-ঝাড়গ্রাম। মানে পর্যটন। সেটা মনে হয় দোষের না – দোষ বলা উচিতও না। উইলসনের বায়োফিলিয়ার* কথা আমাদের অনেকের স্মরণে আসতে পারে।

কিন্তু গ্রামের কথা আলাদা। গ্রামের পশুখাদ্য - জ্বালানি - জীবিকা - ঘর বানানো-গেরস্থালি - ওষুধ - কখনো কখনো খাদ্য, সবটাতেই বন। এমনকী বনের সঙ্গে বিনোদনও লেগে আছে ওখানে। মনে পড়তে পারে অযোধ্যার শিকার উৎসবের কথা, বনবিবি পালা, দক্ষিণ রায়ের পালার কথা। জনজাতির জাহের থানের কথাও এখানে আসতে পারে। মানে, বন তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর পরিচয়, তাঁর সংস্কৃতি। বন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর উপায়।

একটু ভেঙে বলি। নাহলে বোঝানো যাবে না। গরু-ছাগল-মুরগি বনে চরে। বন থেকে আসে বাবুই ঘাস, দড়ি বানানোর। শালপাতা – থালা বানানোর। বনের গাছে লাক্ষা পালন হবে। তসর পালন হবে। বন থেকে মধু আসবে। মোম আসবে। কাঠ-হোগলা-গোলপাতায় ঘর ছাওয়া হবে। ছাতু ও কেন্দুপাতা সংগ্রহ করা হবে। কোদাল-কাস্তে-লাঙলের বাঁট, নিমতেল নিষ্কাশনের সরঞ্জাম সব হবে। এর সঙ্গে ফলপাকুড়, ওষুধ, জঙ্গলের জমি পাট্টা পাওয়া, চাষবাস সবই আছে।

শহরের সঙ্গেও বনের একটা যোগ আছে। যোগটা কেনা-বেচার অংশটায়। মানে মধু-মোম-শালপাতার থালা, তসরের পোশাক-আশাক, জানলা-দরজা, আসবাবপত্র, স্কুলের বেঞ্চ, গেরস্থলির টুকিটাকি ইত্যাদি তাকে কিনতে হয়। তাই বন তারও লাগবে। বন ছাড়া সে এগুলো পাবে না। বন তার বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করবে। বৃষ্টিতে সাহায্য করবে। ভূমিক্ষয় কমাবে।

* এডওয়ার্ড উইলসন। খ্যাত জীববিজ্ঞানী। বায়ো-সোসিওলজির প্রবর্তক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ বিতর্কিত। www.nytimes.com / www.answers.com এই দুই ওয়েবসাইট দেখুন।

এসব শহরের মানুষ ভাবে না। মানে তাকে ভাবতে দেওয়া হয় না। তাই অরণ্যরক্ষার কথা বললে, শহরবাসী আমরা গাছের উপকারিতায় চলে যাই। অরণ্য সপ্তাহে আমরা স্কুলে স্কুলে কেবল গাছ লাগাই। এভাবে শহর অরণ্য নিয়ে অজ্ঞ থাকে। অজ্ঞ থাকলে পুঁজির সুবিধে হয়। শহরবাসী-গ্রামবাসী অনৈক্য যতদিন থাকে ততদিন সমস্বরে কেউ বলেনা– যে জঙ্গল সবার, কেবল পুঁজির কাঁচামাল বা পরিকাঠামোর জোগানদার নয়। গুরু-চণ্ডাল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমানের মতো এই বিভাজন যত থাকে ততই মঙ্গল।

গ্রাম-শহরের এই ভাগাভাগির পাশাপাশি, এই অরণ্যব্যবস্থার আর একটা দিক আছে। তা হল বন দফতর। এখানেই রয়েছে আস্থা ফেরানোর গল্প।

জঙ্গলে কাঠ চুরি হচ্ছে, গোপন লেনদেন হচ্ছে, বন-রক্ষা কমিটির সঙ্গে দফতরের বনিবনা হচ্ছে না। গ্রামবাসী ভাবছেন, বিট অফিসার বদল হলেই সব ঠিক হবে। রামের বদলে শ্যাম বা শ্যামের বদলে যদু আসবে। সব সমাধান হবে।

ওদিকে দফতর বন বাড়াতে-কমাতে ইউক্যালিপটাস লাগাচ্ছে। দফতরের কর্মীরা বনবিদ্যা শিখছে জার্মানির কাছে, ইংল্যান্ডের কাছে। ওদের দেশের ধাঁচে। দেরাদুনে গিয়ে শিখছে। আরাবাড়ি শুরু হচ্ছে, আরাবাড়ি শেষও হচ্ছে। মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। বিবাদ বাঁধছে বনকর্মীর সঙ্গে। তখন আইন আসছে। মানুষের হারানো আস্থা আবার ফিরছে–ফেরানো হচ্ছে। আস্থা আসছে–আস্থা যাচ্ছে। বিশ্বাস ভাঙাগড়ার উপাখ্যান তৈরি হচ্ছে। আইন এসে জঙ্গলে রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের ধারণাকে আর একবার প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। আইন লেখা হচ্ছে ইংরেজিতে। আইন লেখা হচ্ছে, আইনের পরিভাষায়। যার উপকার, তার ভাষায় নয়। কেউ ভাষান্তর করছেন। পৌঁছে দিচ্ছেন সেখানে। আবার পড়তে না পারার অসুবিধে। তখন কথায় বোঝানো হচ্ছে। এই করে সময় গড়াচ্ছে। আস্থা-বিশ্বাস আটুট থাকছে। পুঁজি হাতে সময় পাচ্ছে।

এর মধ্যে এসে যাচ্ছেন সমাজকর্মী। তুলে ধরছেন এই বনাধিকার আইনের অমিত সম্ভাবনাকে। তাহলে, রইল চারজন। গ্রামবাসীর জঙ্গল-নির্ভর বেঁচে থাকা, সমাজকর্মীর ওই বেঁচে থাকায় সাহায্য করা, রাষ্ট্রের নাগরিককে ভালো রাখার দায়িত্ব ও শহরবাসীর প্রায় না জেনে থাকা। আর একজন আছে – সে পুঁজি, তার পরিবেশ থেকে কাঁচামাল লাগবে! ◘

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত [illegible] কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ঠিকানা : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৮২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc@vsnl.com, www.drcsc.org

জৈব কৃষক সমন্বয়

রাসায়নিক সার-তেলে জেরবার কৃষির। ফলন কমছে, অসুখবিসুখ বাড়ছে। লোপাট হচ্ছে জীব-বৈচিত্র।

এই কৃষির উল্টোদিকে আর একটা কৃষি আছে। যার নাম জৈব কৃষি। যা ফলন থেকে পরিবেশ সবকিছুকেই রক্ষা করে। তবে এই কৃষির বিকাশেরও কিছু শর্ত আছে।

অনেকেই জৈব চাষ করি। নিজের মাটিতে নিজের মতো করে ফলন বানাই। ফলন ভালো করতে নতুন নতুন কারিগরিও ব্যবহার করি। কোথাও কোথাও পরীক্ষানিরীক্ষাও করি। এইসব কারিগরি, পদ্ধতি ও নিরীক্ষার খবরের, জেলায়-জেলায় দেওয়া নেওয়া হয়না। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সেভাবে নেই। নেই এক পাকাপোক্ত বাজারও।

ডিআরসিএসসি এইজন্য একটা সমন্বয় বা যুক্তমঞ্চ তৈরি করছে। যুক্তমঞ্চ এই কাজগুলো করবে। কাজ শুরু হবে আগস্ট ২০০৯-এ। এখন পর্যন্ত সদস্য হয়েছেন ছয় জেলার ৩৫ জন কৃষক। এই ছয় জেলা হল উ. ২৪ পরগনা, দ. ২৪ পরগনা, পূ. মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী। এই সমন্বয় যাতে জৈব চাষকে ভবিষ্যতে ছড়িয়ে দিতে পারে সারা বাংলায়, জোর থাকবে সেই দিকে সবসময়।

উৎসাহী জৈব কৃষক সহজেই যোগাযোগ করতে পারেন :

যো||গা||যো||গ
ডিআরসিএসসি | ২৪৪২ ৭৩১১ | ২২৪১ ১৬৪৬ | ৯৭৩২৬৯১৯৮২
ই মেল : training@drcsc.org | tapas.drcsc@gmail.com

প্রচ্ছদ-ছবি লোকচিত্র অনুপ্রাণিত